
সুশীল
কুমার
দাশগুপ্ত

বিক্রমাদিত্যের সিংহাসন কথা

কালিদাসের "দ্বাত্রিংশৎ-পুত্তলিকা"র ছায়াবলম্বনে

সুশীলকুমার দাশগুপ্ত

ভিতরের চিত্র এঁকেছে লেখক পুত্র
শ্রীমান সুপর্ণকুমার দাশগুপ্ত ▫ বয়স ১০

অয়ন প্রকাশন
৪, নিমাই বোস লেন ▫ কলিকাতা-৬

—ঃ উৎসর্গ ঃ—

মধুমিতা, চন্দ্রিমা, সৌম

সুপর্ণ ও রাজকে

পরিবেশক

রূপম

প্রকাশ ১০ই ডিসেম্বর ১৯৮৩ □ প্রকাশিকা শ্রীমতী শিখা কর

□ প্রচ্ছদ শ্রীসুবোধ দাশগুপ্ত
মুদ্রণ—শান্তিনাথ প্রেস □ দাম ১০.০০

সূচীপত্র

ভূমিকা

কালিদাসের "দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা"য় রাজা বিক্রমাদিত্যের ত্যাগ, উদারতা ও দানশীলতার পরিচয় রূপকধর্মী কাহিনীর মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। এই রূপকাশ্রয়ী কাহিনীগুলিকে আধুনিক যুগের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সঙ্গতিসাধন করে, বয়স নির্বিশেষে সকলের মনের উপযোগী করে পরিবেশন করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে পরিমার্জন, পরিবর্তন ও সংক্ষেপ করতে হয়েছে। বিক্রমাদিত্যের চরিত্রগৌরব এবং তাঁর প্রেমময় হৃদয়বৃত্তির মধ্যে যে চিরন্তন মূল্যবোধ বা ভালোমন্দ বোধশক্তির প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় মানুষের পরিবর্তনশীল জীবনে তা নিশ্চিতই কল্যাণকর পথের সন্ধান দেবে।

এই গ্রন্থ প্রকাশের জন্য শ্রীসঞ্জয় করকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আমার পুত্র শ্রীমান সুপর্ণকুমার দাশগুপ্ত (১০) গ্রন্থের ভিতরের ছবিগুলি এঁকেছে।

সুশীলকুমার দাশগুপ্ত

৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৩
১০, রাষ্ট্রগুরু এভিনিউ
দমদম্। কলিকাতা-৭০০০২৮

আমাদের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বই

ডঃ অরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায়—	ক্ল্যাসিক ওয়ার্ল্ড বুক অফ নলেজ	৫০·০০
" "	পৃথিবী	১০·০০
" "	জল	১০·০০
" "	মাটি ও শিলা	১০·০০
নীলকণ্ঠ	রামায়ণ	১০·০০
"	মহাভারত	১০·০০
"	জাতক	১০·০০
"	পঞ্চতন্ত্র	১০·০০
সুশীল কুমার দাশগুপ্ত	বিক্রমাদিত্যের সিংহাসন কথা	১০·০০
" "	গ্রীক পুরাণের গল্প	১০·০০
" "	ভারতীয় পুরাণের গল্প	৫০·০০
শিখা কর	টক ঝাল মিষ্টি	৮·০০
" "	উল ও নক্সা	১০·০০
কল্পতরু	আমি স্বর্গাবিষ্কারক বলছি	১৫·০০
সুদীপ সেন	১০০০ রাজা ও রাষ্ট্রনায়ক	৩৫·০০
সুনির্মল রায়	১০০০ বিস্ময়কর আবিষ্কার	৩৫·০০
" "	১০০০ অসাধারণ মানুষ	৩৫·০০
তাপস আদিত্য	কণ্ঠ সঙ্গীত	১৫·০০

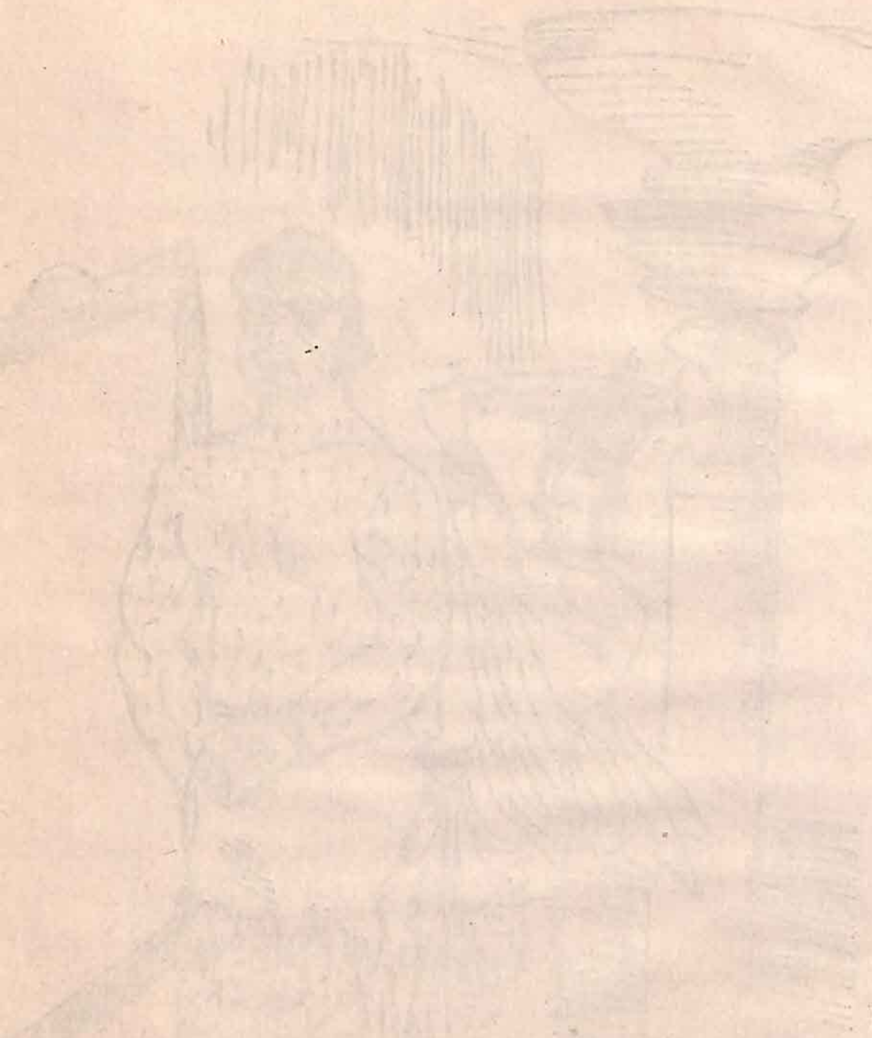









VK.



বিক্রমাদিত্যের বত্রিশপুতুল খচিত সিংহাসন

বিক্রমাদিত্যের মত দানশীল ও উদারহৃদয় রাজা ভারতে অদ্বিতীয় ছিল। আপামর মানুষের জন্য তাঁর গভীর ভালবাসা ও সহানুভূতির কথা কিংবদন্তী হয়ে আছে। শিশু-বৃদ্ধ-দরিদ্র-আর্ত-পীড়িত সকলের জন্য তাঁর হৃদয় ছিল উন্মুক্ত। তাঁর কীর্তির কথা বিস্তৃত হয়েছিল দিক থেকে দিগন্তে। স্বর্গেও তাঁর দানধর্ম ও ঔদার্যের সুখ্যাতি হত।

একবার দেবরাজ ইন্দ্র এক সমস্যায় পড়েছিলেন। বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গ করতে উর্বশী ও রম্ভার মধ্যে কোন্ নর্তকীকে তিনি বিশ্বামিত্রের কাছে পাঠাবেন তা স্থির করে উঠতে পারছিলেন না। ইন্দ্র এবং অন্যান্য দেবতারা স্বর্গের এই দুই নর্তৃকীর নৃত্য বারে বারে দেখেও উৎকর্ষের দিক থেকে দুজনকেই সমান বলে মনে করছিলেন—দুজনের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ এ বিচার করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। দুজনের মধ্যে আবার একে অপরের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বলে দাবি করল। মুশকিল আসান করতে নারদ এগিয়ে এলেন। তিনি ইন্দ্রকে পরামর্শ দিলেন যে উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্যই যোগ্য পুরুষ যিনি এই শ্রেষ্ঠত্বের বিচার করতে সমর্থ। ইন্দ্র তখন তাঁর দূত মাতলিকে পাঠালেন মর্তে, বিক্রমাদিত্যকে নিয়ে আসতে তাঁর কাছে।

মাতলি বিক্রমাদিত্যকে স্বর্গে দেবরাজের সভায় নিয়ে গেলে ইন্দ্র তাঁকে যথাযোগ্য সম্মান দিয়ে তাঁর ওপর বিচারের ভার দিলেন উর্বশী ও রম্ভার মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ তা নির্ধারণ করতে। সকল কলাবিদ্যায় বিশেষত সঙ্গীত ও নৃত্যে রসজ্ঞ ছিলেন বিক্রমাদিত্য।

নৃত্যমঞ্চে উর্বশী ও রম্ভাকে আহ্বান করা হল। প্রথমে রম্ভাকে নৃত্য প্রদর্শন করার সুযোগ দেওয়া হল। প্রাণোচ্ছল নৃত্য রম্ভার, চিত্তচাঞ্চল্যকর নৃত্যভঙ্গিমা। তারপর পালা এল উর্বশীর। অনুপম অনবদ্য সে নৃত্য। বিক্রমাদিত্য উর্বশীকেই শ্রেষ্ঠতর নর্তকী হিসাবে রায় দিলেন। কারণস্বরূপ বললেন, নৃত্যশাস্ত্রের সমস্ত লক্ষণগুলি উর্বশীর মধ্যে রয়েছে। নৃত্যের রাগ-তাল-লয়-মাত্রা অনুযায়ী উর্বশীর মনের বিস্তার, চোখ-মুখের অভিব্যক্তি, অঙ্গ ও পদচালনা শাস্ত্রসম্মত রস পরিবেশনে সার্থক। এই যুক্তি দেখিয়ে এবং রম্ভার অশাস্ত্রীয় স্বতন্ত্রধারার নৃত্যের সমালোচনা করে বিক্রমাদিত্য উর্বশীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন। বিক্রমাদিত্যের এই সুচিন্তিত বিচারে পরম প্রীত হয়ে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁকে রত্নখচিত মহামূল্য এক সিংহাসন দান করলেন। বত্রিশটি পুতুল খোদিত ছিল সেই সিংহাসনে। অপরূপ সুন্দর এই সিংহাসনটি নিয়ে বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনীতে ফিরে এলেন এবং এই সিংহাসনে বসেই দেশের শাসনকার্য সমাধা করেছিলেন বরাবর, উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে।

ভোজরাজের পরীক্ষা

বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পর ইন্দ্র-দত্ত সেই সিংহাসনে আরোহণ করার ক্ষমতা কারোরই ছিল না। রাজহীন উজ্জয়িনীতে একদিন দৈববাণী শোনা গেল—ইন্দ্রদত্ত সিংহাসনে বসে রাজ্য পালন করার অধিকার যখন আর কারোর নেই তখন এটিকে কোন পবিত্রস্থানে রাখা হোক। সেই নির্দেশমত রাজ-অমাত্যরা সেটিকে নিয়ে মুক্ত অঙ্গনে এক পবিত্রস্থানে রেখে দিলেন।

কালক্রমে উজ্জয়িনীতে রাজপদে অধিষ্ঠিত হলেন ভোজরাজ। তাঁরই আমলে এক ব্রাহ্মণ যেখানে সেই সিংহাসনটি রাখা হয়েছিল সেই জমিতে ফল-ফলাড়ির চাষ করেছিলেন। ব্রাহ্মণ অবশ্য জানতেন না যে তাঁর চাষের জমির মধ্যে একটি সিংহাসন রয়েছে, বহু বছরের ব্যবধানে সিংহাসনটি মাটির তলায় চাপা পড়ে যায় এবং সেখানে একটি ঢিবি ছাড়া আর কোন চিহ্ন অবশিষ্ট রইল না। ফলের বাগানে পাখি তাড়ানোর জন্য সেই উঁচু ঢিবিতে মাচা বেঁধে রেখেছিলেন ব্রাহ্মণ, মাচায় উঠে পাখি তাড়াতেন তিনি নিজেই।

একদিন রাজপুত্রদের নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে ভোজরাজ দেশ পর্যটনে বেরিয়ে অকস্মাৎ সেই খেতের কাছে উপস্থিত হলেন। ব্রাহ্মণ তখন সেই মাচার উপরে বসেছিলেন। রাজাকে দেখতে পেয়েই ব্রাহ্মণ হাত-জোড় করে রাজা এবং তাঁর পরিজনদের আমন্ত্রণ জানালেন তাঁর বাগানের ফলফলাড়ি যথেচ্ছ খেতে। তাঁদের ঘোড়াদের জন্য পর্যাপ্ত ছোলা আছে বাগানে, তাও জানালেন তিনি। ব্রাহ্মণ বললেন, রাজন, আজ আমার জন্ম সার্থক আপনার মত মহামান্য অতিথিকে আপ্যায়ন করতে পেরে। পরক্ষণে মাচা থেকে নেমে কিন্তু অন্যসুরে কথা বলতে লাগলেন ব্রাহ্মণ। রাজাকে অনুযোগের সুরে বললেন তিনি, 'কেন আপনি এই অধর্মের কাজ করছেন? এই অসহায় দরিদ্র ব্রাহ্মণের

চাষের জমি নষ্ট করে দেবেন কেন? লোকে অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য আপনার শরণাপন্ন হয়, আর আপনি কিনা নিজেই অন্যায় করতে চলেছেন। রাজা যদি প্রজাপীড়ন করেন আর বিদ্বান লোক যদি পাপের পথে পা দেন তাহলে তাঁদের কি কেউ নিবৃত্ত করতে পারে?'

ব্রাহ্মণের এই পরস্পর বিরোধী কথা শুনে—একবার খেতে আমন্ত্রণ জানানো, অন্যবার রাজার বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগ—এই উদ্ভট আচরণে রাজা পরিজনদের নিয়ে খেতের বাইরে চলে এলেন।

ব্রাহ্মণ তখন আবার মাচায় উঠলেন। মাচায় উঠেই রাজাকে চলে যেতে দেখে চিৎকার করে বলতে লাগলেন, 'যাচ্ছেন কেন মহারাজ! ছোলাগাছগুলোকে ঘোড়াদের খেতে দিন আর আপনারা এসে বাগানের শশা পেড়ে খান. প্রাণভরে যতখুশী শশা খান।'

সেকথা শুনে রাজা যেই তাঁর পরিজনদের নিয়ে খেতের মধ্যে ঢুকলেন তখন মাচা থেকে নেমে রাজাকে বাগানের কোন কিছু ধরতে নিষেধ করলেন তিনি।

অবাক কাণ্ড! রাজা তো ভেবে কুলকিনারা পেলেন না। ব্রাহ্মণ যখন মাচায় ওঠে তখন নিজের দান-ভোগ সম্বন্ধে বুদ্ধি বিবেচনার পরিচয় দেয়, আবার যখন মাচা থেকে মাটিতে নেমে আসে তখন তাঁর বুদ্ধি হয় বিপরীত। রাজা তখন নিজেই মাচায় উঠে দেখতে গেলেন, ব্যাপারটা কি। মাচায় ওঠার পর ভোজরাজের মন পাড়ি দিল অনেক উঁচুস্তরে। মহত্ত্ব ও উদারতার সঞ্চার হল তাঁর হৃদয়ে। পৃথিবীর মানুষের দুঃখকষ্ট দূর করা, আর্ত-পীড়িতদের সেবা করা, দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন, পরার্থে আত্মত্যাগ—এইসব মহতী চিন্তা তার মনে ভর করল। রাজা তখন উপলব্ধি করতে সক্ষম হলেন কেন এই মাচার উপরে উঠলে ব্রাহ্মণের মনে সুবুদ্ধি ও সদিচ্ছার উদয় হয় আর কেনই বা মাটিতে নামলে তাঁর মাথায় অন্য বুদ্ধি আসে। এই মাচার উপর ক্ষণিকের জন্যেও উঠলে ব্রাহ্মণের মনে যে শুচিতা আসে তাই তাঁকে তখন বিজ্ঞ প্রাজ্ঞ করে তোলে, বুঝলেন ভোজরাজ। জলে তেল, দুষ্টের কাছে গোপন বিষয়

ক্ষাঁস, সৎপাত্রে সামান্য কিছু দান এবং পণ্ডিত ব্যক্তিদের কাছে সামান্য শাস্ত্র-অধ্যয়নের প্রভাব ব্যাপক।

টিবির উপরে এই মাচার মাহাত্ম্য দেখে ভোজরাজের ধারণা হল গোটা খেতটাই নিশ্চয়ই মহা মূল্যবান। তখন তিনি ব্রাহ্মণকে বললেন, 'এই খেতটি খুবই লক্ষ্মীমন্তা। ব্রাহ্মণ, তুমি আমাকে এটি বিক্রি করবে?'

ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন, 'মহারাজ, আপনি দীনদরিদ্রের পালক। আপনি সাক্ষাৎ বিষ্ণুর অবতার—আপনার কৃপাদৃষ্টি যার উপরে পড়ে তার ঘরে কখনও দুঃখদৈন্য থাকে না। আপনি হলেন কল্পতরু—যা চাওয়া যায় আপনার কাছে তাই লাভ করা যায়। খেতের মূল্য নিয়ে আমার কোন চিন্তা নেই। আপনি খেতটি নিতে চেয়েছেন এতেই আমি ধন্য এবং এও আমি জানি যে আপনার নজরে যখন পড়েছি তখন আমার দুঃখ দারিদ্র্য থেকে উদ্ধারের পথও আপনি করে দেবেন।'

ব্রাহ্মণের কথা শুনে রাজা তাঁকে পর্যাপ্ত দানধ্যান করে ঐ খেতটি তার কাছ থেকে গ্রহণ করলেন। যে টিবির ওপর মাচাটি ছিল তার ওপরেই রাজার কৌতূহল জন্মেছিল প্রবল। তাই তিনি লোক দিয়ে কালবিলম্ব না করে টিবিটি খোঁড়ালেন। মানুষসমান গর্ত হলে দেখা গেল চন্দ্রকান্ত শিলায় তৈরি নানা রত্নখচিত এবং বত্রিশ পুতুলযুক্ত অনিন্দ্যসুন্দর এক সিংহাসন। সেই সিংহাসন থেকে যেন এক বিদ্যুৎ-দ্যুতি ঠিকরিয়ে আসছে। রাজা এবং তাঁর লোকজনেরা সিংহাসনটিকে তুলতে অনেক আয়াস করলেন কিন্তু কিছুতেই সেটিকে বিন্দুমাত্র নড়াতে পারলেন না তাঁরা! শেষে প্রধানমন্ত্রীকে তলব করিয়ে ডাকিয়ে আনালেন রাজা। এর মধ্যে কি রহস্য থাকতে পারে মন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করতে বসলেন রাজা। মন্ত্রী এই সিদ্ধান্তেই এলেন, দিব্য ও অপূর্ব এই সিংহাসন বলি-হোম-পূজা ছাড়া তোলা অসাধ্য। মন্ত্রীর এই কথা শুনে রাজা ব্রাহ্মণদের ডেকে তাঁদের দিয়ে শাস্ত্রবিধি-সম্মত যাগযজ্ঞ করিয়ে সিংহাসনটি তোলার ব্যবস্থা করলেন। যাগযজ্ঞ

অন্তে সিংহাসনটিকে অনায়াসেই তোলা গেল। মন্ত্রীর পরামর্শেই এই সিংহাসন তোলা সম্ভব হল তাই রাজা মন্ত্রীকে বললেন, বুদ্ধিমানদের সঙ্গ সত্যিই সৌভাগ্যের ব্যাপার ; বুদ্ধিমানদের সংস্পর্শে প্রাপ্তিযোগ ও সুখলাভ হয়। রাজা তারপর লোকজনদের নিয়ে সিংহাসনটিকে মহা সমারোহে নগরে নিয়ে গেলেন।

প্রথম পুতুলের কথা

মহা ধুমধাম করে ভোজরাজ সুবিশাল ও সুসজ্জিত এক মণ্ডপ নির্মাণ করিয়ে সেখানে সেই দিব্য সিংহাসনটিকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। বন্দীদের বন্দনাগানে ও প্রজাদের জয়গানের মাঝে ভোজরাজ দরিদ্র-আর্ত-পীড়িত ও খঞ্জদের দানে তুষ্ট করলেন। তারপর শুভমুহূর্তে শাস্ত্র-বিদ ব্রাহ্মণদের আশীর্বাদ গ্রহণ করে তিনি সিংহাসনে উপবেশন করতে পা তুলেছেন যেই, সিংহাসনের খোদিত বত্রিশটি পুতুলের মধ্যে একটি পুতুল রাজাকে বাধা দিয়ে বলল—

'হে ভোজরাজ, সিংহাসনে আরোহণ করার আগে একবার চিন্তা করুন, আপনি কি সত্যই এই সিংহাসনে বসার উপযুক্ত? এই সিংহাসনটি কার জানেন? রাজা বিক্রমাদিত্যের! বিক্রমাদিত্যকে এটি দান করেছিলেন দেবরাজ ইন্দ্র। এই দেবদত্ত সিংহাসনে বসতে হলে বিক্রমাদিত্যের মতো উদারতা, মহত্ত্ব ও দয়ার্দ্র মনের অধিকারী হওয়া চাই। আপনার মধ্যে কি সেরকম ঔদার্য গুণ আছে?'

ভোজরাজ উত্তরে বললেন, 'নিশ্চয়ই আছে। তুমি যেসব মহৎ মানবিক গুণের কথা বললে, আমার মধ্যে তা সবই আছে। আমিও দানধ্যানে বিক্রমাদিত্যের সমকক্ষ। আমার কাছে কোন দানপ্রার্থী শূন্যহাতে ফিরে যায় না।'

পুতুল বলল, 'ছি ছি রাজন, নিজের মুখেই নিজের প্রশংসা করছেন। নিজের গুণগান যে করে সে তো সজ্জন হতে পারে না। দুর্জনেরাই তো নিজের গুণগান করে আর অন্যের দোষ অন্বেষণ করে। পরের দোষ আর নিজের গুণের কথা বলতে পারে না তাঁরাই, যাঁরা প্রকৃত সজ্জন। সুতরাং নিজের মুখে নিজের প্রশংসা করতে নেই, পরনিন্দা করাও পাপ।'

পুতুলের এই কথা শুনে ভোজরাজের অনুতাপ হল। সত্যিই

নিজের প্রশংসা নিজেই করে ফেলেছেন। তিনি পুতুলকে বললেন, 'নিজের প্রশংসা করে আমি মূর্খের পরিচয় দিয়েছি। এটা খুবই অনুচিত হয়েছে। আমায় বল তুমি সেই পুণ্যশ্লোক বিক্রমাদিত্যের কথা।' পুতুল তখন বলল, 'রাজা বিক্রমাদিত্য দয়া ও করুণার অবতার ছিলেন। নিঃস্ব, দুঃস্থ, দরিদ্র অসহায় মানুষের জন্য প্রাণ তাঁর অহরহ কাঁদত। অযাচিত হয়ে দানধ্যান করতেন তাঁদের। আর তাঁর কাছে যাঁরা দানপ্রার্থী হয়ে আসতেন তাঁরা যদি প্রকৃতই সাহায্য পাবার যোগ্য বিবেচিত হতেন, তাহলে সহস্র, অযুত লক্ষ, সুবর্ণমুদ্রাও দিয়ে দিতেন তিনি তাঁদের। এতবড় মনের অধিকারী কি আপনি? ধনরত্ন থাকলেই কি তা উজাড় করে দেওয়া যায়? বিক্রমাদিত্য ছাড়া আর কোন রাজাই এইভাবে নিজের সুবিপুল ভাণ্ডার অকাতরে নিঃশেষ করে দানধর্ম পালন করেন নি। আপনার মধ্যে যদি এইরকম উদারতা, ধৈর্য ও মহানুভবতা থাকে তবেই এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।'

ভোজরাজ নীরব রইলেন। বাকি একত্রিশটি পুতুলও ভোজরাজকে বিক্রমাদিত্যের সিংসাসনে বসার সুযোগ না দিয়ে একে একে বিক্রমাদিত্যের চারিত্রিক গুণের কাহিনী শোনাল তাঁকে।

দ্বিতীয় পুতুলের কথা

বিক্রমাদিত্য একদিন তাঁর দূতদের আদেশ দিলেন পৃথিবী পরিক্রমা করতে বিভিন্ন দিকে চলে যেতে, যেখানে তারা অহোরাত্র যাগযজ্ঞ পূজা-আর্চা অনুষ্ঠিত হতে দেখবে, তার কথা যেন তারা এসে তাঁকে জানায় বললেন।

বেশ কিছুদিন কেটে গেল। এত দূতঃপৃথিবী পরিক্রমা করে এসে রাজার সামনে উপস্থিত হয়ে অভিনব এক খবর দিল—'মহারাজ, চিত্রকূট পাহাড়ের কাছে তপোবনের মধ্যে দেখে এলাম এক অপরূপ সুন্দর মন্দির। পাহাড়ের উপর থেকে ঝর্ণাধারা বয়ে আসে নীচে মন্দিরের কোল ঘেঁষে। সেই স্ফটিকস্বচ্ছ জলে স্নান করলে সর্বপাপ থেকে মুক্ত হয় জীব। পাপীতাপীর দেহে এই জল কৃষ্ণবর্ণ ধারণ ক'রে হরণ করে তাদের সর্বপাপ। এই জলে স্নান করার সৌভাগ্য যার হয় সেই পুণ্যাত্মা। আর সেই মন্দিরের সামনে এক ব্রাহ্মণ বহুবছর ধরে একাদিক্রমে হোমযজ্ঞ করে চলেছেন। তার হোম-কুণ্ডের বাইরে পর্বতপ্রমাণ ভস্ম জমে উঠেছে। সেই ব্রাহ্মণ মৌনব্রত ধারণ করে আছেন। কারোর সঙ্গে কথা বলেন না। এমন তীর্থস্থান আমি আর দ্বিতীয়টি দেখলাম না এই পৃথিবীতে।' এ হেন তীর্থস্থানে না দেখলে জীবনই সার্থক হবে না—একথা চিন্তা করে রাজা দূতকে নিয়ে চিত্রকূট পাহাড়ে এসে তপোবনের মধ্যে সেই মন্দিরের সামনে উপস্থিত হলেন। সেই মন্দির এবং তার ধ্যানগম্ভীর পরিবেশ দেখে রাজার মধ্যে প্রগাঢ় ভক্তিচেতনা জাগল। তিনি মন্দিরটির পাশেই বয়ে যাওয়া পাহাড়ী-ঝর্ণার জলে পুণ্যস্নান করে মন্দিরের দেবতাকে প্রণাম করে ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কতদিন ধরে এই হোমযজ্ঞ করছেন। মৌনাবলম্বী ব্রাহ্মণ কোন উত্তর দিলেন না। বিক্রমাদিত্য তখন তাঁর নিজের পরিচয় দিলে ব্রাহ্মণ মুখ খুললেন। তিনি একশত বৎসর ধরে হোম করছেন

বললেন। ব্রাহ্মণ আক্ষেপ করলেন, একশো বছর পার হয়ে গেল, তবু তার এই হোমযজ্ঞে দেবতা প্রসন্ন হচ্ছেন না।

বিক্রমাদিত্য বুঝলেন দেবতারা ব্রাহ্মণের ওপর অবিচার করছেন, এত দীর্ঘকালের ও এই একনিষ্ঠ সাধনায় দেবতারা অযৌক্তিকভাবে সাড়া দিলেন না। বিক্রমাদিত্য তখন ব্রাহ্মণের কল্যাণে নিজেই হোমযজ্ঞে আহুতি অর্পণ করলেন। তাতেও সাড়া দিলেন না দেবতা। বিক্রমাদিত্য এবার ঠিক করলেন তিনি তাঁর মস্তক ছেদন করে আহুতি দেবেন যজ্ঞের আগুনে। তিনি তরোয়াল দিয়ে যেই নিজের শিরোশ্ছেদ করতে গেলেন, অমনি দেবতার অদৃশ্য শক্তিতে তাঁর তরোয়াল স্থির হয়ে গেল। অদৃশ্য থেকে বললেন দেবতা— 'বিক্রমাদিত্য, তোমার উপর প্রসন্ন হয়েছি, তুমি যা বর প্রার্থনা করবে, পূরণ করব আমি।' রাজা বললেন, 'হে দেবতা, এই ব্রাহ্মণ বহুকাল ধরে হোমানল প্রজ্জ্বলন করে তপস্যা করে চলেছেন অথচ দেব-অনুগ্রহ থেকে এখনও বঞ্চিত কেন এই ব্রাহ্মণ? আর আমার ওপরেই বা এত সহজে দেবতা প্রসন্ন হলেন কেন?'

দেবতা বললেন, 'রাজন, এই ব্রাহ্মণ হোমযজ্ঞ করে সাধনা করছে বহুকাল ধরে জানি আমি। এ নিরলস হোম করে চলেছে ঠিকই, কিন্তু এর মনে নিষ্ঠা বা একাগ্রতার অভাব আছে, তাই এর উপর প্রসন্ন হতে পারছি না।' কয়েক মুহূর্ত নিস্তব্ধতার পর দেবতার কণ্ঠস্বর আবার শোনা গেল, 'আচারসর্বস্ব পূজায় আমাকে পাওয়া যাবে না। আমি মাটি, কাঠ বা পাষাণে কোথাও থাকি না, মৃন্ময়ী মূর্তিতেও না, এটি উপলব্ধির বিষয়; আমি থাকি মনের মাঝে, ভাবের মধ্যে থাকি আমি; অন্তরে আমাকে উপলব্ধি করতে পারে যে, সিদ্ধি হয় তারই।'

তারপর বিক্রমাদিত্যকে উদ্দেশ করে দেবতা বললেন, 'পরের স্বার্থেই নদীর বয়ে চলা, পরের কারণেই দুধ দেয় গাভী, পরের জন্যই ফুল ধরে গাছে; গাছ নিজে রোদে পুড়ে ছায়া দেয় অন্যকে। হে রাজন, তুমিও এদেরই মত পরার্থে জীবন উৎসর্গ করতে চেয়েছিলে। ধন্য রাজা, তোমার অভিলাষ পূর্ণ হবে।'

তৃতীয় পুতুলের কথা

বিক্রমাদিত্য ভাবেন, তাঁর তো রাজঐশ্বর্যের সীমা নেই, অঢেল বিত্তসম্পদ তাঁর। এতসব ধনদৌলত নিয়ে করবেন কি তিনি! দান-ধ্যান ছাড়া তো আর ধনদৌলতের সার্থকতা থাকে না কোনো, সৎপাত্রে ধনসম্পদ দান করলে ধনেরও সদ্গতি হয়, পুণ্যও সঞ্চয় হয়। তাই তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন দানধ্যানই তার জীবনের চরম উদ্দেশ্য হবে।

এক বিরাট যজ্ঞের আয়োজন করলেন বিক্রমাদিত্য। দেবতা, ঋষি এবং জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল স্তরের মানুষকে তিনি আমন্ত্রণ জানালেন সেই যজ্ঞে—দানে-মানে সকলকে তুষ্ট করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন।

নিমন্ত্রণ-তালিকায় সমুদ্রের নামও ছিল। বিক্রমাদিত্য সমুদ্রকে আমন্ত্রণ করতে এক ব্রাহ্মণকে পাঠালেন। ব্রাহ্মণ সমুদ্রতীরে গিয়ে সমুদ্রে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করে বললেন 'হে সমুদ্র, উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্য এক বিরাট দানযজ্ঞের আয়োজন করেছেন। তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন আপনাকে নিমন্ত্রণ করতে।' সমুদ্র সে নিমন্ত্রণের কথা শুনে এক জ্যোতির্ময় শরীর নিয়ে ব্রাহ্মণের সামনে আবির্ভূত হয়ে বললেন, 'বিক্রমাদিত্য আমাকে দানযজ্ঞে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, এতে আমি বিশেষ সম্মানিত বোধ করছি। দান-প্রতিদান, কুশল কামনা, খাওয়া ও খাওয়ানো—এসবই প্রেমপ্রীতির লক্ষণ। বন্ধুত্ব যদি গভীর হয়, থাক না দুজনে যতদূরেই, মনের বন্ধন ঠিকই থাকে। আর মনের বন্ধন যদি শিথিল হয়, যত কাছেই থাক না দুজনে, বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে না কিছুতেই। আমার আর উজ্জয়িনীর মধ্যে কত দূরত্বের ব্যবধান! কিন্তু বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে আমার মনের যোগ ঠিকই রয়েছে। ময়ূর আর মেঘ, সূর্য আর পদ্ম, চাঁদ আর কুমুদ,

এদের পরস্পরের মধ্যে কি বিরাট দূরত্বের ব্যবধান তবু একের প্রতি অন্যের টান প্রবল। বিক্রমাদিত্য আর আমার মধ্যে সেরকমই টান। বিক্রমাদিত্যের দান-যজ্ঞ অনুষ্ঠানে যাওয়া আমার একান্ত কর্তব্য। কিন্তু আমি এখন অত্যন্ত ব্যস্ত থাকায় ঐ অনুঠানে যোগ দিতে পারছি না। মহাযজ্ঞে সম্প্রদানের জন্য আমি আপনার হাত দিয়ে রাজাকে চারটি রত্ন পাঠাচ্ছি। প্রথম রত্নটির গুণ হল, তার কাছে যা ধন চাওয়া হবে, তাই পাওয়া যাবে। দ্বিতীয় রত্ন অমৃতসমান খাবার উৎপন্ন করবে। তৃতীয় রত্ন সৃষ্টি করবে চতুরঙ্গ সেনা—অশ্ব ও রথসহ পদাতিক বাহিনী। চতুর্থ রত্ন থেকে সৃষ্টি হবে দিব্য সব অলঙ্কার।'

ব্রাহ্মণ সেই রত্ন চারটি নিয়ে উজ্জয়িনীতে ফিরে এলেন। বিক্রমাদিত্যের কাছে গিয়ে যখন তিনি সেই রত্নকয়টি দিতে গেলেন, তখন যজ্ঞ শেষ হয়ে গেছে। রাজা দানপ্রার্থীদের দানধ্যানে সন্তুষ্ট করে বিশ্রাম করছিলেন। ব্রাহ্মণ রত্ন চারটির গুণ বর্ণনা করে সেগুলিকে যখন রাজার হাতে দিতে গেলেন, রাজা তাঁর হাত দুটি ধরে তাঁকে নিবৃত্ত করে বললেন 'হে ব্রাহ্মণ, আপনি যজ্ঞ-দক্ষিণার সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর এসেছেন। আমি সকল আমন্ত্রিত ব্যক্তি ও দানপ্রার্থীকে দানে-মানে সন্তুষ্ট করেছি। উপস্থিত সকল ব্রাহ্মণকে আমি দক্ষিণা-দানে তুষ্ট করেছি। আপনাকেও দক্ষিণা দান করব আমি। আপনি এই চার রত্নের মধ্যে যেটি পছন্দ নিন।' ব্রাহ্মণ তখন বললেন তিনি গৃহিণী, পুত্র ও পুত্রবধূকে জিজ্ঞেস করে ঠিক করবেন, কোন্ রত্নটি তিনি নেবেন। রাজার সম্মতি নিয়ে তিনি রত্নগুলি বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে পরিজনদের জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ রত্নটি প্রয়োজন তাদের।

ব্রাহ্মণের পুত্র বলল, যে রত্নটি চতুরঙ্গ সেনা দেবে, সেই রত্নটিই তার মনঃপুত। ব্রাহ্মণ পুত্রকে উপদেশ দিলেন, চতুরঙ্গ সেনা দিয়ে রাজ্যলাভ ক'রে কোন সুখই আসবে না। রাজ্যশাসনে কোন সুখ নেই; কারণ রামের বনবাস, পাণ্ডবের বনবাস, নলরাজার রাজ্য খোয়ানো, লঙ্কেশ্বর রাবণের করুণ নিয়তি—এসবই জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হয়ে

রয়েছে; রাজ্য থেকেই তাঁদের এই দুর্গতি হয়েছিল। তাই চতুরঙ্গ সেনা চাইবার কোন অর্থ হয় না। পুত্রকে পিতা আরও বললেন, যে রত্নটি ধন দেবে, সেইটি চাওয়াই বরং ভাল। যার ধন আছে তার সবই আছে—এই যুক্তি দেখিয়ে তিনি বললেন, বুদ্ধিমান লোক সব কিছুর চেয়েই ধনই কামনা করে বেশি।

ব্রাহ্মণের স্ত্রী বললেন, যে রত্ন থেকে হাজারো সুস্বাদু খাবার পাওয়া যাবে, সেইটিই নেওয়াই সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত হবে। কেননা, তিনি বললেন, মানুষের প্রাণের অস্তিত্বই নির্ভর করে আহার্যের ওপরে। ব্রাহ্মণের স্ত্রী আরও যুক্তি দেখালেন, ঈশ্বর পৃথিবীর প্রাণীদের জীবন-ধারণের জন্য খাদ্যোপকরণ সৃষ্টি করেছেন। তাই অন্নই মানুষের সর্বাধিক কাম্যবস্তু হওয়া উচিত।

কিন্তু ব্রাহ্মণের পুত্রবধূ অন্যকথা বললেন, যে রত্নটি বিবিধ রত্নের অলঙ্কার সৃষ্টি করবে, সেইটিই নেওয়া যথাযথ কাজ হবে। পুত্রবধূ তাঁর এই দাবির সপক্ষে বললেন, শুভ্রবসন যেমন মানুষকে সৌভাগ্য এনে দেয়, তেমনি ভূষণও মানুষের পক্ষে কল্যাণকর। অলঙ্কার এক-দিকে যেমন দেহ-সৌষ্ঠব বাড়ায়, অন্যদিকে আবার তার মাহাত্ম্য আছে দেবতাদের তুষ্টিতে।

ব্রাহ্মণের পরিবারের তরফ থেকে কোন্ রত্নটি নেওয়া হবে, সেবিষয়ে কিছুতেই সহমত হল না। তখন ব্রাহ্মণ বিক্রমাদিত্যের কাছে গিয়ে বললেন যে তার পরিবারের চারজনই ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করছেন বাঞ্ছিত রত্ন নির্বাচনের ব্যাপারে। রাজা সেকথা শুনে চারটি রত্নই ব্রাহ্মণকে দিয়ে দিলেন।

গল্পটি শেষ করে পুতুলটি মন্তব্য করল, 'কোনো উপাধি বা প্রতিষ্ঠার জোরে ঔদার্যগুণ বা কোন মানবিক গুণ লাভ করা যায় না। সহজাত গুণ বংশ-রক্তের সঙ্গে যুক্ত থাকে। চাঁপাফুলের গন্ধ, মুক্তাফলের রূপ আর আঁখের মিষ্টত্ব তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। মানুষের ঔদার্যগুণও তেমনি সহজাত।'

চতুর্থ পুতুলের কথা

বিক্রমাদিত্যের আমলে এক জ্ঞানী-গুণী ব্রাহ্মণ বাস করতেন উজ্জয়িনীতে। কিন্তু ব্রাহ্মণের অসীম বিদ্যা-বুদ্ধি-গুণ থাকা সত্ত্বেও তাঁর মনে সুখ ছিল না। ব্রাহ্মণ নিঃসন্তান ছিলেন। ব্রাহ্মণের চেয়ে ব্রাহ্মণের স্ত্রীর মনে দুঃখ ছিল বেশি। স্ত্রীর ধারণা ছিল, অপুত্রকের গতি নেই, পুত্রমুখ না দেখলে পুণ্যলাভ হয় না। সৎপুত্রই বংশের প্রদীপ। তাই বংশনাশের আশঙ্কায় তিনি স্বামীকে পুত্রলাভের জন্য ব্রত অনুষ্ঠান পালনের জন্য অনুরোধ করলেন।

ব্রাহ্মণ অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে প্রদোষব্রতের অনুষ্ঠান পালন করলেন। এই ব্রতের মাহাত্ম্যে তাঁর স্ত্রী অচিরেই একটি পুত্রসন্তান প্রসব করলেন। বারো দিনের মাথায় ব্রাহ্মণ পুত্রের নামকরণ করলেন দেবদত্ত। তারপর যথাসময়ে একে একে পুত্রের অন্নপ্রাসন ও উপনয়ন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করলেন ব্রাহ্মণ। উপনয়নের পর ব্রাহ্মণ পুত্রকে বেদশাস্ত্রে শিক্ষিত করে যোল বছর বয়সে তার বিয়ে দিয়ে তীর্থযাত্রা করতে চলে গেলেন বারাণসীতে। তীর্থে যাবার আগে ব্রাহ্মণ পুত্রকে নানান উপদেশ দিয়ে গেলেন, যেমন জীবনে যত কষ্টই আসুক না ধর্মের পথ পরিত্যাগ করবে না ; ঈশ্বরকে ভক্তি করবে ; যাঁরা ধর্মপ্রাণ মানুষ তাঁদের অনুসরণ করবে ; নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে ; সজ্জনদের সংস্পর্শে থাকবে, দুর্জনদের পরিহার করবে।

ব্রাহ্মণ সস্ত্রীক বারাণসীতে তীর্থ করতে এলেন। দেবদত্তও উজ্জয়িনী ছেড়ে বারাণসীতেই বাস করতে লাগলেন। একদিন দেবদত্ত যজ্ঞের কাঠ সংগ্রহ করতে গিয়ে এক গভীর বনের মধ্যে ঢুকে পড়েছিলেন। সেই বনে রাজা বিক্রমাদিত্য তখন শিকার করতে এসেছিলেন। একটি শূকরের পিছু পিছু ছুটতে ছুটতে রাজা বনের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলেন। রাজা বন থেকে বাইরে যাওয়ার জন্য

এদিক ওদিক ছোটাছুটি করতে করতে দেবদত্তকে দেখতে পেয়ে তার কাছে নগরের পথের সন্ধান চাইলেন। দেবদত্ত রাজাকে পথ দেখিয়ে বনের বাইরে নিয়ে এসে নগরে পৌঁছে দিলেন।

গভীর জঙ্গল থেকে তাঁকে উদ্ধার করে লোকালয়ে পৌঁছে দেবার জন্য বিক্রমাদিত্য দেবদত্তের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন এবং তাকে নানা উপঢৌকন দিয়ে উচ্চসম্মানে ভূষিত করলেন।

সেই ঘটনার পর থেকে রাজা কেবলই ভাবতে লাগলেন, কিভাবে দেবদত্তের উপকার থেকে ঋণমুক্ত হবেন তিনি। শেষে একদিন এক পণ্ডিত ব্রাহ্মণের কাছে তিনি দেবদত্তের প্রসঙ্গ পেড়ে তার প্রতি নিজের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে লাগলেন বার বার।

রাজার মধ্যে কৃতজ্ঞতাবোধ প্রকৃতই আছে কিনা তা যাচাই করতে ব্রাহ্মণ রাজপুত্রকে রাজপ্রাসাদ থেকে গোপনে নিয়ে এসে নিজের বাড়ীতে রাখলেন। রাজপুত্রের অলঙ্কারগুলি ভৃত্যের হাতে দিয়ে বিক্রয় করতে বাজারে পাঠিয়ে দিলেন তিনি।

এদিকে রাজবাড়ীতে হুলুস্থুলুস কাণ্ড বেধে গেছে। রাজপুত্রকে পাওয়া যাচ্ছে না। চারিদিকে খোঁজাখুজি হল। কিন্তু কোথাও তাকে পাওয়া গেল না। পুত্রের সন্ধানে বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনী নগরের বিভিন্ন প্রান্তে অনুচরদের পাঠালেন। এক অলঙ্কারের দোকানে এক রাজকর্মচারী অলঙ্কার হাতে একটি দুঃস্থ লোককে দেখতে পেল। রাজকর্মচারীটি সেই অলঙ্কার পরীক্ষা করে দেখল যে সেটি রাজকুমারের, লোকটিকে জিজ্ঞেস করতেও সে তা স্বীকার করল। কি করে সে এই অলঙ্কার পেল—এই জেরার উত্তরে দেবদত্তের ভৃত্যটি বলল, এই অলঙ্কার দেবদত্ত তাকে দিয়েছে ; সে তার ভৃত্য ; দেবদত্ত বলেছেন তাকে, বাজারে গিয়ে এটি বিক্রি করে অর্থ নিয়ে আসতে।

রাজকর্মচারীটি তখন দেবদত্তের ভৃত্যকে নিয়ে রাজার কাছে গিয়ে বলল যে দেবদত্ত রাজকুমারকে গায়েব করে তার অলঙ্কার খুলে নিয়ে এই চাকরটিকে পাঠিয়েছিল বাজারে বিক্রি করতে। রাজা তা শুনে দেবদত্তকে তলব করে আনিয়ে জিজ্ঞেস করলেন তাকে, 'দেবদত্ত, তুমি

কি করে এই অলঙ্কার পেলে? আমি বিশ্বাস করতে পারছি না যে তুমি রাজকুমারকে পাচার করেছ অলঙ্কারের লোভে।'

দেবদত্ত নিঃসঙ্কোচে উত্তর দিল, 'হ্যাঁ মহারাজ, আমি অলঙ্কারের লোভে রাজকুমারকে রাজপ্রাসাদ থেকে গোপনে বার করে নিয়ে এসে হত্যা করেছি।'

দেবদত্তের এই কথা শুনে রাজা এবং উপস্থিত সকল সভাসদেরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। একজন সভাসদ বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠে বললেন, শাস্ত্রজ্ঞানের অধিকারী হয়েও এই মানুষটি কিভাবে এই দুষ্কার্যে লিপ্ত হল, চিন্তা করা যায় না। অন্য এক সভাসদ তখন মন্তব্য করলেন, মনে হয় পূর্বজন্মের কর্মফলের জন্যেই এর এমন পাপকাজ করার দুর্মতি হয়েছে। শেষে সকল সভাসদেরা একমত হয়ে রাজাকে বললেন, 'এই শিশুহত্যাকারী ও স্বর্ণচোরকে শূলে চড়িয়ে বধ করা উচিত।' দেবদত্তের বিষয়ে সভাসদদের কঠোর অভিমতের কথা শুনে বিক্রমাদিত্য বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না। তিনি তাঁদের শান্ত-মেজাজে বললেন, 'দেবদত্তের সাহায্যেই আমি জঙ্গল থেকে প্রাণ হাতে করে ফিরে এসেছি। সুতরাং আমার প্রাণরক্ষাকারীর প্রতি আমি চির কৃতজ্ঞ এবং সঙ্গত কারণ থাকলেও আমি তার অনিষ্ট সাধন করতে পারব না। এখন এ আমার আশ্রিত এবং তার জীবনের ভালমন্দের দায়িত্ব আমার; সজ্জন মানুষ কখনই আশ্রিতের ক্ষতিসাধন করে না।' তারপর দেবদত্তকে রাজা বললেন, 'তোমার অপরাধের বিচার করা আমার পক্ষে খুবই অন্যায়ের কাজ হবে। তোমার কোন ভয় নেই। আমার পূর্বজন্মের কর্মের ফলেই আমি আমার পুত্রকে হারিয়েছি। তুমি নিমিত্তমাত্র। তুমি স্বেচ্ছায় এই কাজ কর নি। কোনো অদৃষ্ট শক্তি তোমাকে দিয়ে এই কাজ করিয়ে নিয়েছে। দেবদত্ত, তুমি আমার যে উপকার করেছিলে তার ঋণ আমি কোনদিনই শোধ করতে পারব না।' রাজা দেবদত্তকে আশ্বস্ত করলেন, বন্দীদশা থেকে সে মুক্ত; তার প্রতি তাঁর কোন অভিযোগ নেই। দেবদত্ত বাড়ী চলে গেলেন।

কয়েক ঘণ্টা পর দেবদত্ত বাড়ী থেকে ফিরে এসে রাজকুমারকে বিক্রমাদিত্যর কাছে এনে হাজির করলেন। রাজা তো পুত্রকে ফিরে পেয়ে আনন্দে অভিভূত হয়ে গেলেন। তিনি সবিস্ময়ে দেবদত্তকে বললেন, 'তুমি রাজকুমারকে হত্যা কর নি? অথচ বললে, রাজকুমারকে চুরি করে এনে হত্যা করেছ তার গায়ের অলঙ্কারের লোভে। খুলে বল আমাকে কি ব্যাপার এসব।'

তখন দেবদত্ত বিক্রমাদিত্যকে বললেন, 'মহারাজ, আপনি একদিন এক ব্রাহ্মণকে বলেছিলেন, 'দেবদত্তের উপকারের প্রতিদান আমি কোনদিনই দিতে পারব না, তার ঋণ কোনোদিনই শোধ করতে পারব না।' তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য অর্থাৎ আপনার কথা ও মনের মধ্যে সামঞ্জস্য আছে কিনা বোঝার জন্য ব্রাহ্মণ রাজকুমারকে লুকিয়ে রেখে ঘটনাটিকে সাজিয়েছিলেন আপনার মনের পরীক্ষা করতে।'

বিক্রমাদিত্য তা শুনে উৎফুল্ল মনে বললেন, যে পরোপকারীকে বিস্মৃত হয়, সে তো মহাপাপী।

দেবদত্ত কৃতজ্ঞচিত্তে বললেন; 'রাজা, আপনি জগতের উপকার করেন। পরের কল্যাণ, পরের মঙ্গলের জন্যেই আপনি জীবন উৎসর্গ করেছেন। পরের কারণেই নিবেদিত-প্রাণ যে, সে যথার্থই সুমন, সুজন, কৃতী ও সুখী।'

পঞ্চম পুতুলের কথা

বিক্রমাদিত্যের কাছে একবার এক রত্নবিক্রেতা এসে এক অমূল্য রত্ন তাঁর হাতে দিলেন। বিক্রমাদিত্য রত্নপরীক্ষকদের দিয়ে সেটিকে যাচাই করে নিলেন। রত্নপরীক্ষকেরা সেটি দেখে রাজাকে বলল, মহা দুর্লভ রত্ন এটি। তারা সেই রত্নের মূল্য স্থির করল—ছ'কোটি স্বর্ণমুদ্রা।

রাজা রত্নটি বণিকটির কাছ থেকে কিনে নিয়ে জানতে চাইলেন, ঐরকম আর কতগুলি রত্ন তার কাছে আছে। বণিক জানাল, সঙ্গে তার কাছে ঐ একটি রত্ন ছিল ; তবে দশটি রত্ন তার দেশের বাড়ীতে আছে। রাজা তখন সেগুলিও কিনতে চাইলে বণিক রাজী হয়ে গেল। রাজা তখন সেগুলির মূল্য তাকে অগ্রিম দিয়ে এক বিশ্বাসী মণিকারকে তার সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন। যে নগরে বণিকটি থাকত রত্নকয়টি নিয়ে সেখান থেকে ফেরার পথে সেই মণিকার প্রবল ঝড়বৃষ্টির মধ্যে পড়ল। পথে একটা নদী পড়ে। সেই নদী তখন প্রবল বৃষ্টিতে ফুলে ফেঁপে উঠছে। নদীর উত্তাল জল আর ফোঁস-ফোঁসানির জন্য কোন মাঝিই রাজী হচ্ছিল না তাকে নৌকোয় পার করে দিতে। শেষে এক মাঝিকে মণিকার বোঝাল, তাকে রাজ-আজ্ঞা পালন করতে হচ্ছে। এক কঠিন দায়িত্ব তার ওপরে রয়েছে। 'নদী পার হওয়া, না হওয়া ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে কিছু এসে যায় না ; কিন্তু এখানে রাজকার্যই বড়, ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছা থেকে রাজকর্তব্যে অবিচল থাকাই অনেক মহৎ ব্যাপার,' বলল সে। রাজ-কর্তব্যটি এমন কি মহৎ যে তাকে জলে ঝড়ে নদী পার হতে হবে, নাবিকটি মণিকারকে জিজ্ঞেস করলে মণিকার উত্তর দিল, 'দশটি রত্ন সঙ্গে আছে আমার, এগুলি নিয়ে আজ যদি রাজার কাছে যেতে না পারি, তাহলে রাজ-আদেশ ভঙ্গের অভিযোগে আমার শাস্তি হবে।

মাঝি তা শুনে বলল, 'ঠিক আছে, তুমি আমাকে পাঁচটি রত্ন দিয়ে দাও, বাকি পাঁচটি রত্ন তুমি রাজার কাছে নিয়ে যাও। তোমাকে আমি নদী পার করে দিচ্ছি।' মণিকার তাতেই রাজী হয়ে গেল, অবশ্য মনে মনে আশঙ্কা করল, যদি রাজা এই ঘটনার কথা বিশ্বাস না করেন তাহলে বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগে অভিযুক্ত হবে সে। যাই হোক মাঝিটির সঙ্গে এই শর্তে রাজী হওয়া ছাড়া তার আর কোন উপায় ছিল না।

পাঁচটি রত্ন নিয়ে মণিকার উজ্জয়িনীতে পৌঁছে রাজার সঙ্গে দেখা করল। রাজা সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, বাকি পাঁচটি রত্ন কোথায়। মণিকার তখন সবিস্তারে রাজাকে পুরো ঘটনাটির কথা বলল। বিশেষ করে বলল সে, মণিকারকে সে জানিয়েছিল রাজাকে সে কথা দিয়েছিল যে আট দিনের দিন রত্নকয়টি নিয়ে রাজার সঙ্গে দেখা করবে; বাধ্য হয়েই মাঝিটিকে সে পাঁচটি রত্ন দিয়েছিল রাজকর্তব্য পালন করতে।

সব শুনে মণিকারের উপর রাজার আস্থা আরও দৃঢ় হল। মণিকার যে বিশ্বাসভঙ্গের কাজ করবে না এটা রাজা জানতেন। মণিকারের এই কর্তব্যপরায়নতার প্রতিদানস্বরূপ রাজা তাকে পাঁচটি রত্নই দিয়ে দিলেন। মণিকার বিস্ময়ে থ হয়ে গেল।

আবার যেই ভোজরাজ সিংহাসনে উঠতে গেলেন, অমনি তাঁকে বাধা দিয়ে আর এক পুতুল আচমকা বলল, 'চৈত্র মাসের বসন্তোৎসবের সময় রাণীকে নিয়ে বিক্রমাদিত্য একবার তার প্রমোদ-উদ্যান সংলগ্ন গৃহে কিছুদিন বাস করেছিলেন। সারবন্দী তরুরাজিতে সুসজ্জিত সে বাগান বর্ণে-গন্ধে মাতোয়ারা ছিল তখন ফুলের সমারোহে। চন্দ্রকান্ত আর ইন্দ্রনীল পাথরে গড়া ছিল সে প্রমোদ-সৌধ। বাইরে প্রমোদ-উদ্যানে ফুলের উৎসব আর হর্ম্যের ভিতরে অপরূপ পুষ্পসাজ ও সুরভিত অগুরুর মহিমায় স্বপ্নরঙিন এক জগৎ সৃষ্টি হয়েছিল তখন সে প্রমোদ-নিকেতনে।

রাজাকে দেখে ব্রহ্মচারীর মনে নতুন এক চিন্তার সঞ্চার হল। তিনি ভাবতে লাগলেন, জীবনটা অপস্থা করেই কেটে গেল। জীবনের আনন্দ-সুখ থেকে চিরদিনই নিজেকে বঞ্চিত করেছে সে। জীবনকে না ভালবেসে জীবন থেকে মুক্তি পাবার জন্যই সাধনা করে চলেছে সে। জীবনে তাঁর এই চলার পথ সঠিক নয় বলেই তাঁর এখন মনে হল। বিষয়-সুখ আর গৃহী-জীবন মানুষের প্রকৃতিগত; একে উপেক্ষা করে মোক্ষলাভের চেষ্টা করলে তা সার্থক হতে পারে না, ব্রহ্মচারীর এই ধারণা হল এখন। বিষয়-সুখ আর বিবাহিত জীবন মানুষের দুঃখের কারণ; এ কথাও তার কাছে আর সঙ্গত মনে হল না। স্ত্রী এবং সংসারের জন্যই মানুষ ধন চায়, জীবনে সচ্ছলতা সাচ্ছন্দ্য চায়। আর একা একা জীবন-যাপন করলে সমস্ত জীবনটাই মানুষের নিরর্থক হয়; জীবনে কোন কিছুতেই সে যথার্থ আনন্দ খুঁজে পায় না। সংসারে স্ত্রীলোকেরাই সবচেয়ে আদরের পাত্রী; তাদের জন্যেই পুরুষের জীবন সক্রিয় ও প্রাণবন্ত থাকে—রাজারাণীর অন্তরঙ্গ দাম্পত্যজীবন দেখে ব্রহ্মচারীর এই ধারণা হল।

ব্রহ্মচারী প্রমোদ-নিকেতনে বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে দেখা করলে রাজা তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন এবং কি কারণে তিনি তাঁর কাছে এসেছেন জানতে চাইলেন। ব্রাহ্মণের মনোবাঞ্ছা পূরণ করবেন তিনি যথাসাধ্যভাবে, কথা দিলেন ব্রাহ্মণকে।

তখন ব্রহ্মচারী বললেন, 'আমি ঈশ্বরের সাধনায় আজ পঞ্চাশ বছর সন্ন্যাস-আশ্রমে কাটালাম। কিন্তু জীবনে আমি মুক্তির সন্ধান পেলাম না, আনন্দময় জীবনের সন্ধান পেলাম না। এখন আমি ব্রহ্মচর্য পালনের শেষে গৃহাশ্রমে যেতে চাই; গৃহী জীবনের শেষে আমি বাণপ্রস্থে যাব। শাস্ত্রে আছে জীবনে পর পর এই তিন পর্যায় অতিক্রম না করে প্রথমেই যদি কেউ মোক্ষলাভে সাধনা করতে আরম্ভ করে তাহলে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না।

ব্রাহ্মণ অবশ্য অন্তর থেকে এসব কথা বলছিলেন না, বিষয়-সুখকে কেন্দ্র করেই তার সব চিন্তা আবর্তিত হচ্ছিল। বিক্রমাদিত্য ব্রাহ্মণের মনের প্রকৃত অবস্থা বুঝতে পেরেও তাকে নিরাশ করলেন না, কেননা তিমি তাঁকে কথা দিয়েছিলেন যে তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ করবেন।

বিক্রমাদিত্য ব্রাহ্মণের গৃহীজীবনের ব্যবস্থা করলেন একটি নগরীর শাসনভার তাঁর হাতে ন্যস্ত করে। স্বভাবতই রাজত্ব পেয়ে ধনসম্পদের মাঝে ডুবে থাকলেন ব্রাহ্মণ; বিলাসবহুল উচ্ছৃঙ্খল জীবনই তার কাছে পরম প্রিয় ছিল। আদর্শ গৃহীজীবনে যে ত্যাগ, ভালবাসা, চরিত্রগুণ ও ঔদার্য থাকে তার বিন্দুমাত্র লক্ষণও তাঁর আচার-আচরণে দেখা গেল না।

সপ্তম পুতুলের কথা

বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষই সুখে শান্তিতে জীবনযাপন করত। জীবে দয়া, কথায় ও কাজে সত্যনিষ্ঠা, পরোপকারিতা, ঔদার্য গুণ, ভালমন্দ বিচারবিশ্লেষণ ক্ষমতা —এইসব বিবিধ গুণের অধিকারী ছিল বিক্রমাদিত্যের সর্বস্তরের প্রজারা। ব্রাহ্মণেরা শাস্ত্রচর্চা, পূজা-অর্চনা, যাগযজ্ঞ নিয়ে থাকতেন।

প্রজাদের মধ্যে ধনদ নামে এক বণিকের বিত্তের বিশেষ খ্যাতি ছিল। তাঁর বিষয়-আশয় ধনদৌলতের সীমা ছিল না। লক্ষ্মী তাঁকে দুহাত ভরে উজাড় করে ঢেলে দিয়েছিলেন তাঁর ঝাঁপি। কিন্তু বিত্ত সুখে ধনদের শান্তি ছিল না। কেননা, তিনি জানতেন যে সংসারই যখন ক্ষণিকের তখন ধনসম্পদও তো অসাড়। তাই তাঁর উপলব্ধি হয়েছিল অনিত্য এই সংসারে ধর্মই একমাত্র সহায়। তিনি বুঝেছিলেন যে ধর্মের পথে চললেই তার ধনসম্পদের সুষ্ঠু ও কল্যাণকর ব্যবহার হবে। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে ধর্মকে রক্ষা করলে ধর্মই মানুষকে রক্ষা করবে আর ধর্মকে রক্ষা না করলে বা অধর্মের পথে গেলে মানুষকে উপযুক্ত শাস্তি পেতে হবে ধর্মের কাছে।

ধনদ একদিন আনুষ্ঠানিকভাবে বাহ্মণ, শূদ্র, বৈশ্য সকলকে আমন্ত্রণ করে অকাতরে দানধ্যান করে শুদ্ধচিত্ত হলেন। তারপর পুণ্যসঞ্চয়ে শ্রীকৃষ্ণের চরণে নির্মাল্য দেওয়ার জন্য দ্বারকায় রওনা হলেন। দ্বারকার পথে ভুবনেশ্বরীর মন্দিরে এসে ভক্তিভরে পূজা দিয়ে যখন মন্দিরের চারিদিকে তাকালেন, তখন দেখলেন ভুবনেশ্বরীর বাম দিকে পড়ে রয়েছে ছিন্নশির এক দম্পতি। মন্দিরের তোরণে লেখা আছে, নিজের গলার রক্ত দিয়ে দেবী ভুবনেশ্বরীর অর্চনা করেন যদি কেউ, তাহলেই এই যুগল নারী-পুরুষ জীবন ফিরে পাবে।

শ্রীকৃষ্ণের পূজার্চনা ক'রে তাঁর প্রাসাদ নিয়ে উজ্জয়িনীতে ফিরে এলেন। ধনদ বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ দিলেন। রাজা শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ পেয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে ধনদকে তাঁর তীর্থযাত্রা সম্পর্কে বিস্তারিত বলতে বললেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, পথে তিনি কোন অভূতপূর্ব জিনিস দেখেছেন কিনা।

ধনদ আদ্যপান্ত রাজাকে তাঁর তীর্থযাত্রার বিবরণ দিলেন এবং ভুবনেশ্বরীর মন্দিরের কবন্ধ দুটির কথা বিশেষভাবে বললেন।

সেকথা শুনে রাজা কালবিলম্ব না করে ধনদকে নিয়ে ভুবনেশ্বরীর মন্দিরে এসে কবন্ধ দুটিকে দেখলেন। তাই দেখে কবন্ধ দুটির জীবন ফিরিয়ে আনার জন্য রাজা খড়গ দিয়ে দেবীর সামনে নিজের গলা কাটতে উদ্যত হলেন যেই, অমনি দেবী ভুবনেশ্বরী আবির্ভূতা হয়ে তাঁকে নিবৃত্ত করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কবন্ধ দুটি মস্তকসহ জীবন ফিরে পেল।

একদিন বিক্রমাদিত্যের এক দূত তাঁর কাছে এসে বলল, 'মহারাজ, কাশ্মীরে দেখে এলাম, এক ধনী বণিক পাঁচক্রোশ লম্বা একটি দীঘি খুঁড়েছে। কিন্তু কিছুতেই জল উঠছে না সে দীঘিতে। শেষে সেই বণিক শুষ্ক জলাশয়ের গহ্বরে লক্ষ্মী-নারায়ণের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে ব্রাহ্মণদের দিয়ে মহা সমারোহে পূজানুষ্ঠান, যাগযজ্ঞ করালেন, কিন্তু কোন ফলই হল না। একদিন মনের দুঃখে দীর্ঘক্ষণ বসে আছেন ঐ বণিক খটখটে শুকনো সেই দীঘির পাড়ে। এমন সময় দৈববাণী হল ঃ বত্রিশলক্ষণযুক্ত পুরুষের কণ্ঠের রক্তে এই দীঘির মাটি সিঞ্চিত হলে জলে পূর্ণ হবে দীঘি। সেকথা শুনে সেই বণিক দীঘির পাড়ে এক বিরাট অন্নসত্রের আয়োজন করলেন। সেই সত্রে দেশবিদেশ থেকে বহুলোক উপস্থিত হলেন। বণিক তাঁদের বললেন, বত্রিশলক্ষণযুক্ত যে মানুষ তাঁর কণ্ঠরুধিরে সিক্ত করবে এই দীঘির মাটি তাঁকে শতকলস স্বর্ণমুদ্রা দেওয়া হবে। কিন্তু কেউই একাজ করতে উৎসাহী বা সাহসী হল না।'

বিক্রমাদিত্য সেকথা শুনে দূতটিকে নিয়ে কাশ্মীরে এসে স্বয়ং সেই জলশূন্য দীঘির কাছে গেলেন। শুষ্ক দীঘির ভিতর বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর মন্দির দেখে রাজা ভাবলেন, নিজের কণ্ঠ চিরে রক্তে সিক্ত করতে পারি যদি এস্থান, তাহলে জন্ম সার্থক হবে তাঁর। তিনি জানতেন যে যাঁরা নিঃশেষে স্বার্থত্যাগ ক'রে পরের কারণে জীবন উৎসর্গ করেন, নিজের প্রাণকে যারা তুচ্ছ মনে করেন পরহিতব্রতে, নশ্বর শরীর বা জীবন সার্থক হয় তাঁদের।

তখন তিনি শুষ্ক জলাশয়ের ভিতরে প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণুকে পূজা দিয়ে ও তাঁকে প্রণাম করে বললেন, 'হে দেবতা, আপনি বত্রিশলক্ষণযুক্ত পুরুষের কণ্ঠরুধির কামনা করেছেন এই জলাশয়ের জন্য, আমি তাই

নিজের কণ্ঠচ্ছেদ করছি আপনার তুষ্টিতে এই তৃষিত মানুষের জলের প্রয়োজনে।' এই বলে তিনি নিজেয় কণ্ঠচ্ছেদ করতে তরোয়াল তুলে সজোরে কোপ দিতে গেলেন নিজের কণ্ঠে কিন্তু তার আগেই দেবতা তার সামনে আবির্ভূত হয়ে তাঁর তরোয়াল ধরে বললেন, 'বিক্রমাদিত্য, তোমার প্রতি আমি প্রসন্ন হয়েছি ; এই দীঘি এখন জলে পূর্ণ হয়ে যাবে। পরার্থে তোমার এই যে আত্মোৎসর্গের বাসনা তাতে আমি অশেষ প্রীত হয়েছি।'

তারপরেই বিক্রমাদিত্য জলাশয় থেকে উঠে গেলেন। পরমুহূর্তে দেখলেন দীঘিটি জলে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে।

নবম পুতুলের কথা

বিক্রমাদিত্যের পুরোহিত ত্রিবিক্রমের ছেলে কমলাকর। পিতার মত কমলাকর শাস্ত্র-অধ্যয়ন নিয়ে থাকতেন না, বিদ্যা-অর্জনে তার কোন আগ্রহই ছিল না।

ত্রিবিক্রম একদিন পুত্রকে বোঝালেন যে যাদের বিদ্যা নেই, চরিত্রগুণ নেই, ধর্মচেতনা নেই, তারা মানুষই নয়। পুরুষের কাছে বিদ্যাই একমাত্র অলঙ্কার ; জীবনের সৌন্দর্য বিকাশ লাভ করে বিদ্যাকে আশ্রয় করে। বিদ্যা হল কল্পতরু ; বিদ্যাই মানুষকে যশ-মান-খ্যাতির উচ্চ শিখরে তোলে।

পিতার এই উপদেশবাণী শুনে কমলাকরের চৈতন্যোদয় হল। সে প্রতিজ্ঞা করল, প্রকৃত বিদ্বান না হয়ে সে আর পিতার সঙ্গে দেখা করবে না। কমলাকর গৃহত্যাগ করে কাশ্মীরে গিয়ে চন্দ্রমৌলি ভট্টোপাধ্যায় নামে এক নিষ্ঠাবান পণ্ডিতের কাছে দীক্ষা নিয়ে শাস্ত্র-চর্চা করতে শুরু করলেন। কিছুদিন পর শিক্ষা সমাপনান্তে সকল শাস্ত্রে জ্ঞানার্জন করে গুরুর অনুমতি নিয়ে কমলাকর উজ্জয়িনীতে ফিরে চললেন।

পথে কাঞ্চীনগর ,নামে একটি জায়গা পড়ল। সেখানে নরমোহিনী নামে এক অদ্বিতীয়া সুন্দরীর কথা শুনলেন। তার গৃহে যেই যায়, তাকেই নাকি বিন্ধ্যাচলবাসী এক রাক্ষস বধ করে ; প্রাণ নিয়ে কেউই নাকি সে গৃহ থেকে ফিরতে পারে না।

কমলাকর দেশে ফিরে এসে পিতার কাছে তার জ্ঞানানুশীলনের কথা বললেন। কাশ্মীরে গিয়ে আচার্যদেব চন্দ্রমৌলির কাছে শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছে সে, একথা জানাল সে তার পিতাকে। তার পিতা-মাতার আর আনন্দ ধরে না তাদের ছেলে এখন সর্বজ্ঞ হয়েছে। তাঁরা তাকে নিয়ে রাজা বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে দেখা করলেন।

বিক্রমাদিত্য কমলাকরের কাছ থেকে তার সর্বশাস্ত্রে জ্ঞান অর্জনের কথা শুনে অত্যন্ত প্রীত হলেন। রাজা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তার এই বিদেশ ভ্রমণের সময় সে অত্যাশ্চর্য কিছু দেখেছে কিনা। কমলাকর তখন রাজাকে সেই সুন্দরী নারী নরমোহিনী ও সেই ভয়ঙ্কর রাক্ষসের কথা বলল।

রাজা তা শুনে একদিন কমলাকরকে নিয়ে কাঞ্চীনগরে গেলেন নরমোহিনী আর সেই রাক্ষসকে দেখতে।

বিক্রমাদিত্য কাঞ্চীনগরে এসে সেই সুন্দরী রমণী নরমোহিনীর কাছে গেলেন। নরমোহিনী বিক্রমাদিত্যকে চিনতে পেরে বলল, 'মহারাজ, আজ আমি ধন্য ; আমার গৃহে আজ আপনার মত পুণ্যশ্লোক রাজার পদার্পণ ঘটেছে।' নরমোহিনী তাঁকে আন্তরিক-ভাবে আদর-আপ্যায়ন করলেন। রাজা নরমোহিনীর কাছে জানতে চাইলেন, রাক্ষসটি কখন তার ঘরে আসে। নরমোহিনী বলল, রাক্ষস রাতের দ্বিতীয় প্রহরে আসে। রাজাকে সে বলল আপনি যদি এই গৃহে রাত কাটান, তাহলে রাক্ষসের হাতে আপনার মৃত্যু হবে। তাই আপনার এখন এস্থান ত্যাগ করাই শ্রেয়। রাজা সেকথা না শুনে নরমোহিনী যে ঘরে থাকত, তার পাশের ঘরে রাতে লুকিয়ে থাকল। রাতের দ্বিতীয় প্রহরে রাক্ষস এসে দেখল যে নরমোহিনীর ঘরে অন্য কেউ আছে কিনা, যাকেই দেখতে পাবে, তাকেই সে গলা টিপে মেরে ফেলবে। নরমোহিনীর ঘরে কাউকে দেখতে না পেয়ে রাক্ষস যখন ফিরে যাচ্ছিল, রাজা তখন ঘর থেকে বেরিয়ে এসে পিছন থেকে তরোয়ালের কোপ দিল সজোরে রাক্ষসের ঘাড়ে। সঙ্গে সঙ্গে রাক্ষসের গলা দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। তার প্রচণ্ড আর্তনাদে নরমোহিনীর ঘুম ভেঙ্গে গেল ; ছুটে এসে সে দেখলে, রাক্ষসের দ্বিখণ্ডিত দেহ মাটিতে পড়ে আছে, রক্তে ভেসে গেছে মাটি।

রাক্ষসের নিধনে নরমোহিনী উচ্ছ্বসিত হয়ে বিক্রমাদিত্যকে অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাল। বিক্রমাদিত্যকে বলল সে, তাঁরই অসম-সাহসিকতায় এবং তাঁরই কৃপায় আজ তার মুক্তি হল ঐ ভয়ঙ্কর রাক্ষসের উপদ্রব থেকে।

বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে এক মহাযোগী এসেছিলেন উজ্জয়িনীতে। বেদ, পুরাণ, আয়ুর্বেদ, জ্যোতিষ, গণিত, নাট্যশাস্ত্র প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল তাঁর।

বিক্রমাদিত্য সর্বজ্ঞ এই উপাধ্যায়ের কথা শুনে তাঁকে পুরোহিত মারফত রাজ-দরবারে ডেকে আনালেন। রাজা সেই আচার্য পুরুষকে বললেন, তিনি এমন এক মন্ত্র-গুণ তাঁর কাছে পেতে চান, যা তাঁকে জরা-ব্যাধি-মৃত্যু থেকে চিরতরে রক্ষা করবে। আচার্যদেব রাজাকে লোকালয়ের বাইরে চলে গিয়ে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে এক বৎসর ধরে একটি মন্ত্রজপ করতে বললেন। মন্ত্র-সাধনার শেষে হোম-যজ্ঞ করতে বললেন। রাজা সেইমত মন্ত্র-সাধনা সম্পন্ন করে যখন হোমে আহুতি দিলেন, তখন হোমের আগুন থেকে এক জ্যোতির্ময় পুরুষ উঠে এসে এক দিব্য ফল রাজার হাতে দিয়ে বললেন, 'এই ফল আপনি খেলে জরা-ব্যাধি-মৃত্যু রহিত হয়ে চিরযৌবনের অধিকারী হবেন।'

রাজা ঈপ্সিত বস্তু লাভ করে অত্যন্ত প্রফুল্লমনে উজ্জয়িনীতে ফিরে চললেন। পথে এক রোগগ্রস্ত বিশীর্ণ ব্রাহ্মণ রাজাকে আশীর্বাদ জানিয়ে বললেন, 'শরীরই হল ধর্মসাধনার প্রধান উপকরণ, আমার মত দুর্ভাগা লোকের পক্ষে ধর্মাচরণ সম্ভব নয়। করাল কুষ্ঠব্যাধিতে আমি জীর্ণশীর্ণ ও পঙ্গু হয়ে পড়েছি। মৃত্যু আমাকে হাতছানি দিচ্ছে। রাজা, আপনি প্রজার পিতা-মাতা ; যেহেতু রাজা সকল আর্ত মানুষের দুঃখ-কষ্ট দূর করেন, আমার দুঃখ-আর্তি দূর করবেন নিশ্চয়ই আপনি। আপনার কাছে আমার একান্ত প্রার্থনা, শরীর যাতে নিরাময় হয় এবং স্বাভাবিক সুস্থ, আনন্দোজ্জ্বল জীবন যাতে লাভ করতে পারি, ধর্মচারণে সক্ষম জীবনের অধিকারী হতে পারি যাতে, তার ব্যবস্থা করুন হে দয়াময় মহারাজ।'

ব্রাহ্মণের সেই সকরুণ প্রার্থনা শুনে রাজা তাঁকে সেই ফলটি দিয়ে দিলেন। নিজের পুণ্যের ফল আর্তের কল্যাণে দান করে দিলেন বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে।

একবার রাজ্যশাসনের দায়িত্ব মন্ত্রীদের ওপর ন্যস্ত করে বিক্রমাদিত্য যোগীর বেশ ধারণ করে দেশ-বিদেশে পর্যটন করতে বেরোলেন। যেখানেই উল্লেখযোগ্য বা আশ্চর্য কিছু দেখেন, সেখানেই তিনি কিছুদিন থেকে যান।

একদিন বনের মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে সন্ধ্যা হয়ে গেলে বিক্রমাদিত্য আর এগোতে সাহস পেলেন না, তিনি এক বটগাছের তলায় বসে পড়লেন। সেই গাছে চিরঞ্জীবী নামে এক পাখি বাস করত। ঐ গাছে অন্যান্য যেসব পাখি থাকত তারা সারাদিন বহু দূর দূর দেশ ঘুরে ঘুরে উদরপূর্তি করে ঐ বৃদ্ধ পাখির জন্য রোজ প্রত্যেকে একটা করে ফল নিয়ে আসত। রাজা বৃক্ষমূলে থেকে শুনতে পেলেন, চিরঞ্জীবী বলছে অন্যান্য পাখিদের, 'বাছারা, তোমরা তো কত দেশ আজ ঘুরে বেড়ালে, নতুন বা আশ্চর্যের কিছু দেখলে কি ?' এক পাখি উত্তরে বলল, একটা জিনিস দেখে তাঁর মনে আজ খুব দুঃখ হয়েছে। বৃদ্ধ চিরঞ্জীবী তার কাছে দুঃখের কারণ জানতে চাইলে সে বলল, 'উত্তর দেশে শৈবালনগর পর্বতে পলাশনগর নামে এক লোকালয় আছে। বকাসুর নামে এক রাক্ষস শৈবালনগর পাহাড় থেকে পলাশনগরে এসে প্রতিদিন যাকেই সামনে পায় তাকেই ঐ পাহাড়ে নিয়ে গিয়ে জীবন্ত গিলে খায়। পলাশনগরের বহু মানুষ এই রাক্ষসের শিকার হয়। শেষে পলাশনগরের মানুষেরা যুক্তি করে বকাসুরকে বলল, 'বকাসুর, তুমি তো দেখছি সামনে যাকেই পাও তাকেই নৃশংসভাবে মেরে ফেল, এতে আমরা প্রতিমুহূর্ত ভীষণ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে থাকি; আমরাই যদি একজন করে মানুষ পাঠাই প্রতিদিন তোমার কাছে তোমার খাদ্য হিসাবে; তোমার কি তাতে আপত্তি আছে ?' রাক্ষস পলাশনগরের অধিবাসীদের এই প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেল। তারপর

থেকে পলাশনগরের অধিবাসীরা পালা করে প্রতিদিন এক-একটি বাড়ী থেকে এক-একজনকে পাঠায় বকাসুরের কাছে। আজ সেখানে গিয়ে দেখি এক ব্রাহ্মণের বাড়ী থেকে একজনের বকাসুরের খাদ্য হিসাবে যাওয়ার পালা। ব্রাহ্মণের একই পুত্র; পুত্রকে পাঠালে নয়নের মণিকে হারাতে হয়, বংশ নাশ হয়। নিজে গেলে স্ত্রীর বৈধব্য আসবে; আবার স্ত্রীকে পাঠালে গার্হস্থ জীবনই ভেঙ্গে যাবে। ব্রাহ্মণ স্ত্রী-পুত্রকে আঁকড়ে ধরে বেবলই হাউমাউ করে কাঁদছে দেখে এলাম।'

নীচ থেকে পাখিটির মুখ থেকে এই ঘটনার কথা শুনে রাজা সঙ্গে সঙ্গে বনাঞ্চল পেরিয়ে কিছুটা পথ হেঁটেই পলাশনগরে পৌঁছে দেখেন সেই ব্রাহ্মণ বধ্যভূমিতে বসে আছেন। ব্রাহ্মণকে অভয় দিয়ে তাঁকে সরিয়ে বিক্রমাদিত্য নিজেই বধ্যভূমিতে বসে পড়লেন।

মাঝরাতে রাক্ষস শুক্লপক্ষের চাঁদের আলোয় বধ্যভূমিতে এসে দেখল এক প্রশান্তনেত্র হাস্যোজ্জ্বল সুদর্শন পুরুষ বধ্যভূমিতে বসে আছেন। তাঁকে দেখেই রাক্ষসের মধ্যে ভাবান্তর এল। নির্ভয় হাসিখুশি এই মানুষটিকে দেখেই রাক্ষস বুঝতে পারল এই মানুষটি অন্যের প্রাণ রক্ষায় নিজেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে বধ্যভূমিতে বসে আছে। অন্যের প্রাণরক্ষায় যে নিজের প্রাণ-উৎসর্গ করতে চায় সে তো সাধারণ মানুষ হতে পারে না। হতবাক বিস্ময়ে রাক্ষস তাঁকে বলল, 'হে মহাপুরুষ আপনি মানুষের কল্যাণে তাদের দুঃখ হরণ করেছেন; আর দুঃখ হরণকারী সেই মানুষকে যদি আমি নিধন করি, তাহলে ঘোরতর পাপ হবে আমার, এই পাপকর্মের পরিণামে আমার সর্বনাশ হবে। এই শিলায় প্রতিদিন আমার শিকার হিসাবে যে বসে, সে আমার হাতে মরার আগে মৃতবৎই থাকে। মৃত্যুর পূর্বে মানুষের ইন্দ্রিয়গুলি নিস্তেজ হয়ে আসে; আপনার ক্ষেত্রে দেখছি ঠিক বিপরীত অবস্থা। আপনি যেন জীবন-মৃত্যুকে একইভাবে দেখছেন। জীবনের সমস্ত ভালবাসা নিঙড়ে আপনি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে চাইছেন। আপনি অনেক উচ্চমার্গের লোক। বলুন, আপনি কে?' বিক্রমাদিত্য উত্তর দিলেন, 'বধ কর তুমি আমায়। প্রকৃত সাধুসন্ত মানুষ আপামর

মানুষের কল্যাণ কামনা করেন ; তিনি তাঁর নিজের সুখ-দুঃখের চিন্তার কথা ভুলে পরের দুঃখেই দুঃখী হন।' রাক্ষস তখন বলল, 'হে মহাসত্ত্ব পুরুষ, পরের জন্য যে শরীর আপনি ত্যাগ করতে চাইছেন তার মর্যাদা আমাকে দিতেই হবে। আপনার আমি কোন অনিষ্ট তো করবই না, বরং আপনি আমাকে যা নির্দেশ দেবেন আমি তা পালন করব।' তখন বিক্রমাদিত্য তাঁকে বললেন, 'জীবহত্যা মহাপাপ। তোমার প্রাণ যেমন তোমার কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয়, প্রত্যেক জীবের কাছেও তার প্রাণ তেমনই প্রিয়। তাই সমস্ত প্রাণীদের জীবন রক্ষা করাই সজ্জনের কর্তব্য। হে বকাসুর, তুমি তোমার নিজের জীবনকে যেমন ভাবে দেখবে, অন্যের জীবনকেও ঠিক তেমন ভাবেই দেখবে।'

বকাসুর বিক্রমাদিত্যের উপদেশ অনুযায়ী সেইদিন থেকে জীবহত্যা ত্যাগ করল।

দ্বাদশ পুতুলের কথা

বিক্রমাদিত্যের আমলে তাঁর রাজধানীতে ভদ্রসেন নামে এক বণিক ছিল। ভদ্রসেনের অগাধ সম্পত্তি ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়েই তিনি জীবন কাটিয়ে দিয়েছিলেন এবং অর্থ উপার্জনই তার একমাত্র লক্ষ্য ছিল। তিনি মারা গেলে তাঁর ছেলে পুরন্দর পিতার সমগ্র ধনসম্পদের মালিক হয়ে সে ধনসম্পদ রক্ষা করতে অপারগ হলেন। তিনি পৈতৃকসূত্রে পাওয়া ধনদৌলত সৎকাজে এবং অভাবী লোকদের স্বার্থে বিলিয়ে দিয়ে অকাতরে নিঃশেষ করে দিলেন। তাঁর পরম বন্ধু ধনদ তাঁকে সাবধান করে দিয়েছিল যে বিপদে-আপদে এবং ভবিষ্যতের জন্য মানুষের ধনসম্পত্তির প্রয়োজন আর পুরন্দর যদি এইভাবে বেহিসেবী অর্থব্যয় করে চলে তাহলে ভবিষ্যৎ তার অন্ধকার হয়ে যাবে। পুরন্দর উলটে বন্ধুকে এই যুক্তি দেখায় যে যা খোয়া গিয়েছে বা যা হারিয়ে গেছে তার জন্যে অনুশোচনা করা আর ভবিষ্যতের জন্য চিন্তা করা নিরর্থক, বুদ্ধিমান লোক বর্তমান অবস্থা ও সমস্যাদি নিয়েই চিন্তা করে। তাঁর ধারণা ভবিষ্যৎকে কেউই ঠেকাতে পারবে না, আর যা যাবার তা যাবেই।

পুরন্দর যখন কপর্দকহীন হয়ে পড়লেন ধনদৌলত দুহাতে বিলোতে বিলোতে, তখন তিনি নির্বান্ধব হয়ে গেলেন। পুরন্দর দেখলেন তাঁর যখন অর্থ ছিল তার কত বন্ধুবান্ধব ছিল, তারা তাকে কত ভালবাসত, আর আজ তার অর্থসম্পদ কিছু নেই বলে বন্ধুরা তাকে ছেড়ে চলে গেছে; পুরুষ মানুষের অর্থ না থাকলে সে বড় অসহায়, তার পৌরুষত্বে আঘাত লাগে ভীষণ, অর্থ না থাকলে পণ্ডিত ব্যক্তিও লোকের অবহেলার পাত্র হয়।

মনের দুঃসহ ভার থেকে এবং নিরানন্দ জীবন থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায় দেশ পরিভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন পুরন্দর অবশেষে। হিমাচলের কাছে এক নগরের প্রান্তে এক গৃহস্থবাড়ীতে অতিথি হয়ে একটা

রাত কাটালেন তিনি সেখানে। মাঝরাতে কাছাকাছি এলাকায় বাঁশবন থেকে মেয়েলি কণ্ঠে করুণ এক আর্তনাদ শুনতে পেলেন তিনি। পরের দিন গৃহস্থকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন এই বাঁশবনে রোজই মাঝরাতে এক নারীর কান্না শোনা যায়, কিন্তু ভয়ে কেউ সেই বাঁশবনে যায়ও না, কোন খোঁজখবরও নেয় না।

পুরন্দর এই অত্যাশ্চার্য ঘটনার কথা শুনে দেশে ফিরে এসে বিক্রমাদিত্যকে সে ঘটনার কথা জানালেন। বিচিত্র সেই খবর শুনে পুরন্দরকে নিয়ে বিক্রমাদিত্য হিমাচলের কাছে এসে ঐ গৃহস্থের বাড়ী থেকে মাঝরাতে ভেসে আসা সেই সকরুণ কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলেন। রাজা সঙ্গে সঙ্গে বাঁশঝাড়ে ঢুকে দেখলেন এক রমণীকে এক রাক্ষস অনবরত এলোপাথাড়ি মারছে আর সেই রমণী আর্তনাদ করে কাঁদছে। রাজা নিঃশব্দে এবং সঙ্গোপনে রাক্ষসের পিছনে গিয়ে তরোয়াল দিয়ে এক কোপে রাক্ষসের মাথাটি কেটে ফেললেন।

রাক্ষসটির নিধনে সেই নারী কৃতজ্ঞচিত্ত হয়ে রাজার পায়ে লুটিয়ে পড়ে বলল, 'হে মহান পুরুষ, আপনার জন্যই আজ আমার শাপমুক্তি হল। একবার এক গর্হিত অপরাধ করে ফেলি। আমার স্বামী সেজন্যে মৃত্যুকালে আমাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন এই বলে যে প্রতিদিন রাত্রে তোমাকে এক রাক্ষস এই বাঁশবনে নিয়ে গিয়ে নির্যাতন করবে।' তখন আমি স্বামীকে বললাম, 'এতবড় অভিশাপ তুমি আমাকে দিলে! কিন্তু কিভাবে এই অভিশাপ থেকে আমার মুক্তি হবে বলে দাও।' স্বামী তখন আমাকে বললেন, 'যেদিন এক মহাসত্ত্ব পুরুষ এসে রাক্ষসটিকে নিধন করবে, সেদিনই তাঁর পদতলে তোমার মুক্তি হবে। তাঁকেই আমার সকল ধনসম্পদ দিয়ে দেবে।'

সেই নারী তার স্বামীর সঞ্চিত বিপুল ধনসম্পদ রাজাকে দান করলেন। রাজা তখন সেই ধনসম্পত্তি নিঃস্ব পুরন্দরকে দান করে দিয়ে তাকে আবার পর্যাপ্ত ধনসম্পদের মালিক করে দিলেন। রমণীটির জীবনের ব্যয়ভার উজ্জয়িনীর রাজ-কোষাগার থেকে বহন করার ব্যবস্থা করলেন তিনি।

ত্রয়োদশ পুতুলের কথা

রাজা বিক্রমাদিত্য মাঝে মাঝে রাজ্যভার মন্ত্রীদের ওপর ন্যস্ত করে দেশে-দেশে পর্যটন করতেন। সেবার সন্ন্যাসীর বেশে এক নগরে নদীর পাড়ে এক দেবালয়ের কাছ দিয়ে যেতে যেতে দেখলেন, ভক্ত মানুষেরা দেবালয়ে সমবেত হয়ে পুরাণকথকের কাছে পুরাণকথা শুনছেন নিবিষ্টমনে। তিনিও পুণ্য পুরাণকথা শোনার জন্য উদ্‌গ্রীব হলেন। তিনি নদীতে স্নান সেরে শুদ্ধ হয়ে মন্দিরের চত্বরে উঠে গভীর মনোযোগের সঙ্গে পুরাণকথা শুনতে বসলেন। পুরাণকথক তখন পুরাণাদির সারতত্ত্ব বিশ্লেষণ করছিলেন :

'শরীর ও ধন যেহেতু অনিত্য, মৃত্যু যেখানে অনিবার্য, ধর্মচর্চাই মানুষের আত্মাকে শান্তিদান করে। ধর্মের মূল কথা হল পরোপকার মহাপুণ্যের কাজ, পরের ক্ষতিসাধনই মহাপাপের কাজ। যে মানুষ জীবের সুখে সুখী হয় আর জীবের দুঃখে দুঃখিত হয়, তিনিই সনাতন ধর্ম আচরণ করেন—সকল ধর্মের সারকথা তিনিই বুঝেছেন। একজন দুঃখী নিঃস্ব মানুষকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে যে পুণ্য-অর্জন হয়, সহস্র সহস্র আচার্য পণ্ডিতকে দুহাতে প্রণামী দিয়েও যে পুণ্যার্জন করা সম্ভব নয়। বিত্তসম্পদের দাতারা পৃথিবীতে আদৌ দুর্লভ নয়, কিন্তু সর্বজীবে দয়াশীল মানুষ প্রকৃতই দুর্লভ।..."

সেই ধর্মপ্রাণ শ্রোতারা পুরাণ-তত্ত্বকথা ভাবাবিষ্ট হয়ে শুনছিলেন, হঠাৎ এক সময় নদীর বুক থেকে মানুষের চিৎকারে তারা সবাই বিরক্তমনে নদীর দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখলেন এক ব্রাহ্মণ আর আর তার ব্রাহ্মণী নদার স্রোতে ভেসে যাচ্ছে আর ব্রাহ্মণ তাদের দুজনকে উদ্ধার করার জন্য পাড়ের লোকদের অসহায়ভাবে আর্তনাদ করে ডাকছে। কিন্তু কেউই ঐ দুজনকে উদ্ধারের চেষ্টা করতে আগ্রহী হলেন না এমন কি পুরাণ শ্রোতারাও না। বিক্রমাদিত্য ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর ঐ অবস্থা দেখে নিমেষে মন্দির থেকে নেমে গিয়ে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে ডুবন্ত ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীকে উদ্ধার করে তাঁদের পাড়ে নিয়ে এলেন নিরাপদে

ব্রাহ্মণ কিছুক্ষণ বাদে সুস্থ হয়ে উঠে রাজাকে তাঁর অসীম কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বললেন, 'আমার পিতা-মাতা আমাকে প্রথম জন্ম দিয়েছিলেন আর আপনি আমাকে দ্বিতীয় জন্ম দিলেন ; আমার প্রাণ-দান করে আপনি আমার মহা উপকার করলেন, তার ঋণ আমি কোনদিনও শোধ করতে পারব না, কিন্তু প্রত্যুপকার আমাকে করতেই হবে সাধ্যমত। গোদাবরীর জলে আমার বারো বছরের মন্ত্রজপের পুণ্যফল আপনাকে উৎসর্গ করছি। ব্রাহ্মণ কোঁচড় থেকে বার করে এক পুণ্যপুষ্প দিলেন রাজাকে। ব্রাহ্মণ-দত্ত পুণ্যপুষ্প সঙ্গে নিয়ে বিক্রমাদিত্য দেশের উদ্দেশে রওনা হলেন। পথে এক জায়গায় এক ব্রহ্মরাক্ষস রাজার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে তাঁকে বলল, 'সন্নাসীর বেশ আপনার গায়ে ; কিন্তু আপনাকে দেখে তো সন্ন্যাসী মনে হচ্ছে না। বলুন আপনি কে ?' বিক্রমাদিত্য নিজের প্রকৃত পরিচয় দিলেন ব্রহ্মদৈত্যের কাছে। তখন ব্রহ্মদৈত্যটি বলল, 'আমি এই নগরেরই এক বাসিন্দা ছিলাম। আমি এক ব্রাহ্মণ-বংশের সন্তান। লোকের বাড়ী বাড়ী পূজা-অর্চনা উপলক্ষ্যে আমাকে যখন ডাকা হত আমি পূজার্চনায় সম্পূর্ণ ফাঁকি দিয়ে গৃহস্থদের প্রতারিত করতাম তাঁদের অজান্তে আর তাঁদের উপর অযথা চাপ সৃষ্টি করে প্রচুর দান-সামগ্রী নিতাম। আমার এই পাপকাজের জন্য আর গুরু-বৃদ্ধ-সাধু-মহাপুরুষদের প্রতি আমার তাচ্ছিল্য মনোভাব ও অশ্রদ্ধার জন্য প্রতিফল পেতে হল আমাকে। এই পাপে পাশের এই অশ্বত্থ গাছে ব্রহ্মরাক্ষস হয়ে আজ বহু বছর ধরে অভিশপ্ত জীবন কাটাচ্ছি। আপনার মত মহানুভব মানুষ ছাড়া কেউ-ই আমার এই পাপ থেকে আমাকে উদ্ধার করতে পারবে না।

ব্রহ্মরাক্ষসের মুখ থেকে সব কথা শুনে বিক্রমাদিত্য ব্রাহ্মণ-দত্ত পুণ্যফুলের নির্মাল্য তার হাতে দিয়ে তাঁর মুক্তিকামনা করলেন। ব্রাহ্মণ সেই পুণ্যফুলের বলে পাপমুক্ত হয়ে রাজার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে দিব্যরূপ ধারণ করে স্বর্গারোহণ করলেন।

চতুর্দশ পুতুলের কথা

আর একবার ছদ্মবেশে দেশ পর্যটনকালে এক যোগীর সঙ্গে দেখা হয় বিক্রমাদিত্যের। যোগী তাঁর তীক্ষ্ণদৃষ্টিবলে রাজার ছদ্মবেশ থাকা সত্ত্বেও তাঁকে চিনতে পারেন। বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে দু-একটি কথা বলার পরেই যোগী তাঁকে বলেন, 'আপনিই যে রাজা বিক্রমাদিত্য এ আমার বুঝতে বাকি নেই। বলুন তো, আপনি কি উদ্দেশ্যে রাজকাজ ছেড়ে দূর দূর দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন?' রাজা উত্তর দিলেন, 'নানা অত্যাশ্চার্য জিনিস দেখার জন্য ও বিচিত্র সব অভিজ্ঞতালাভের জন্য দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি; সাধুসজ্জনদের সঙ্গও লাভ করা যায় দেশ পর্যটনকালে।' তা শুনে সেই সাধু রাজাকে কৌতূহলী হয়ে বললেন, 'আপনি বিচক্ষণ রাজা হয়েও এমন ভুল করলেন। রাজ্যভার অন্যের উপর, মন্ত্রীদের ওপরেই বা ন্যস্ত করা কি যুক্তিযুক্ত কোনো দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন রাজার পক্ষে! রাজকর্মচারীদের ওপর রাজ্যের ভার ন্যস্ত করে রাজা যদি দেশ ছেড়ে ভ্রমণে ব্যস্ত থাকেন তাহলে সেটা তো বাঘের মুখে আস্ত ছাগল তুলে দেওয়ার সামিল হবে! কৃষি সম্পদ, বিদ্যা, বাণিজ্যসম্পদ, নিজ বিত্ত ও রাজসম্পদ—এসবই একান্তে রক্ষা করা কর্তব্য।' রাজা সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা উত্তর ছুঁড়ে দিলেন, 'যোগীবর, এসব ক্ষেত্রে দৈবই প্রবল। নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী জীবনে সবকিছু চলে না; আপনি নিজের কর্মক্ষেত্র যতই না আগলে রাখুন, যতই সতর্ক থাকুন নিজের স্বার্থসংক্রান্ত বিষয়ে, দৈবের কাছে আপনি নিতান্ত অসহায়। যে হিরণ্যকশিপুকে ইন্দ্রের ঐরাবত সমীহ করে-ছিল, মহাদেবের ত্রিশূলও যে হিরণ্যকশিপুর বুকে প্রতিহত হয়ে ভেঙ্গে পড়েছিল, সেই হিরণ্যকশিপুকেই নৃসিংহের নখে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হতে হয়েছিল।' একথা বলেই বিক্রমাদিত্য যোগীকে একটা গল্প শোনাতে বসলেন—

"রাজশেখর নামে এক রাজা উত্তরদেশে নদীপর্বতবর্ধন নামে এক নগরে রাজত্ব করতেন। তিনি নিষ্ঠাবান ধার্মিক পুরুষ ছিলেন। রাজশেখরের সরলতা ও নির্বিরোধী মনের সুযোগ নিয়ে তার আত্মীয়-স্বজনরা ছলা-কৌশলে তাঁর হাত থেকে রাজ্য ছিনিয়ে নিয়ে তাঁকে সপত্নীক রাজ্য থেকে নির্বাসিত করে দেন।

রাজ্যচ্যুত হয়ে রাজশেখর সপত্নীক দেশে দেশে হারা উদ্দেশ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। এক নগরের উপকণ্ঠে এসে একদিন এক বটবৃক্ষের তলায় ক্লান্ত হয়ে বসলেন স্বামী-স্ত্রী। তখন সূর্য অস্তাচলে ঢলে পড়েছে। সেই বটবৃক্ষের ওপর কয়েকটা পাখির কথা রাজশেখরের কানে ভেসে এল। তারা বলাবলি করছে, এই বটগাছের নীচে যে পুরুষ বসে আছেন তিনিই রাজা হবেন। রাজশেখর সেকথা শুনে যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত হলেন।

রাতটায় রাজা-রাণী এক ধর্মশালায় কাটিয়ে পরদিন ভোরে নিকটস্থ দীঘিতে সূর্যস্তব করে সূর্যকে প্রণাম করে রাজপথে ধরে হেঁটে চললেন।

সেই নগরের রাজা সদ্য মারা যাওয়ায় এবং তাঁর কোন উত্তরাধিকারী না থাকায় রাজকর্মচারীরা এক হস্তিনীকে ফুলের মালা দিয়ে পথে ছেড়ে দিয়েছেন রাজার খোঁজে; হস্তিনীটা যার গলায় মালা দেবে সেই রাজা হবে। রাজশেখরকে সামনে দেখে তাঁর গলায়ই মালা দিল হস্তিনীটা। তখন রাজকর্মচারীরা বিস্ময়বিমূঢ় রাজশেখরকে সসম্মানে নিয়ে গিয়ে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করলেন। বেশ সুখ্যাতির সঙ্গেই রাজশেখর নিরুপদ্রবে রাজ্যশাসন করছিলেন।

কিছুদিন পর শত্রুদেশের রাজারা একত্র হয়ে রাজশেখরের রাজ্য আক্রমণ করলেন। রাজশেখর সে খবর পেয়ে যুদ্ধের পাল্টা প্রস্তুতি না চালিয়ে নিশ্চেষ্ট রইলেন। রাণী তাঁকে কত বোঝালেন, তিনি যদি শত্রুপক্ষের প্রতিরোধের জন্য সৈন্যসামন্ত নিয়ে এখুনই তৈরি না হন তাহলে যে আবার রাজ্য হারিয়ে তাঁদের পথের ভিখারী হতে হবে। কিন্তু রাজশেখর রাণীর কথার কর্ণপাত না করে মন্তব্য করলেন, দৈব যদি অনুকূল হয়, ক্ষতি কারোর হতে পারে না, আর দৈব যদি প্রতিকূল হয়

তাহলে কোন ক্ষতিই রোধ করা যাবে না ; উন্নতি-অবনতি, উত্থান-পতন সবই দৈবনির্ভর। রাজশেখর রাণীকে তাঁর বিশ্বাসের কথা জানালেন, 'যিনি তাঁকে এই রাজ্য দিয়েছেন চিন্তাটা তাঁরই। তিনি আমার সম্বন্ধে চিন্তা করেছিলেন বলেই আমাকে রাজ্য দিয়েছিলেন, নিশ্চয়ই আমার সম্বন্ধে তাঁর নিয়ত চিন্তা আছে, আমার মধ্যেই তিনি রয়েছেন। আমি নিশ্চিত, আমার ভাবনা তিনিই ভাববেন।'

দেবতা অলক্ষ্যে থেকে রাজশেখরের এই কথা শুনে চিন্তা করলেন, 'আমি একে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে একটি রাজ্যের রাজারূপে অভিষিক্ত করেছিলাম লোকচক্ষুর অন্তরাল থেকে। এখন আমি যদি আমার এই অনুগ্রহভাজন সরলপ্রাণ রাজাকে রক্ষা না করি তাহলে এর প্রতি আমার অবিচার করা হবে।'

রাজশেখরের শত্রুপক্ষের সৈন্যদল যখন তাঁর রাজ্য অবরোধ করতে এগিয়ে এল তখন হঠাৎ তাদের মধ্যে ওলাউঠা হয়ে মড়ক লেগে গেল। একে একে সব সৈন্য সেই মহামারীর কবলে পড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। রাজশেখর দেব-অনুগ্রহে নির্বিঘ্নে নিরুপদ্রবে রাজ্যশাসন করতে লাগলেন।"

বিক্রমাদিত্যের মুখে যোগীরাজ এই কাহিনী শুনে পরম সন্তুষ্টচিত্তে তাঁকে কাশ্মীর থেকে আনা একটি শিবলিঙ্গ দিয়ে বললেন, এই শিবলিঙ্গের সামনে যা চিন্তা করবেন তিনি, তাই এ চিন্তামণির মত দান করবে।

যোগীবরকে প্রণাম করে রাজা নগরের পথে ফিরে চললেন। এক ব্রাহ্মণ পথে তাঁকে আশীর্বাদ করে বললেন, শিবলিঙ্গের পূজা করা আমার নিত্য আচার। যে শিবলিঙ্গের আমি পূজা করতাম সেটি হারিয়ে গেছে, আজ তিনদিন ধরে শিবলিঙ্গের পূজা হয় নি, তিনদিন ধরে উপবাসী রয়েছি, শিবলিঙ্গের পূজা না করা পর্যন্ত তো উপবাস ভাঙ্গতে পারব না। বিক্রমাদিত্য সেকথা শুনে ব্রাহ্মণকে কাশ্মীরের শিবলিঙ্গটি দিয়ে দিলেন। ব্রাহ্মণ রাজাকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করে শিবলিঙ্গটি নিয়ে পরিতৃপ্তমনে নিজ ঘরে ফিরে গেলেন।

বিক্রমাদিত্যের পুরোহিত বসুমিত্র সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিতরূপে স্বীকৃত হয়েছিলেন অল্প বয়সেই; ধর্মপ্রাণ ও সুপণ্ডিত এই পুরোহিত রাজার খুবই প্রিয়পাত্র ছিলেন।

বসুমিত্র যেবার ভারতের বিভিন্ন স্থানে তীর্থস্নানে বেরিয়ে প্রয়াগে গিয়ে মাঘস্নান করে বারাণসীতে বিশ্বেশ্বর দর্শন করে দেশে ফিরছিলেন, সেবার পথে এক শাপভ্রষ্ট অপ্সরার রাজ্যে এসে পড়েছিলেন তিনি। লক্ষ্মী-নারায়ণের এক বিরাট প্রাসাদোপম মন্দিরে সেই শাপভ্রষ্ট অপ্সরা, নাম ছিল তার মন্মথসঞ্জীবনী, শাপমুক্তির জন্য এক বিরাট কড়াইয়ে রাতদিন ফুটন্ত তেল রেখেছিল। সারা রাজ্যে সে রাষ্ট্র করে দিয়েছিল, এই ফুটন্ত তেলের মধ্যে যে মাথা ডুবিয়ে বসে থাকতে পারবে তাকেই সে বিয়ে করে শাপমুক্ত হবে। জীবনের প্রয়োজনেই বিয়ে, সেই জীবনই যদি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, তাহলে তো সব শেষ! স্বভাবতই তার প্রস্তাবে সাড়া এল না কোনো।

বসুমিত্র দেশে ফিরে বিশ্বেশ্বরের প্রসাদ আর পূত গঙ্গাজল নিয়ে রাজদর্শন করলেন। বহু তীর্থস্থানে বিক্রমাদিত্য নিজেই ঘুরেছেন আর তাঁর পরিচিত যাঁরাই তীর্থযাত্রা সেরে দেশে ফিরে আসতেন তাঁদের কাছ থেকেও বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্রের বৃত্তান্ত শুনতেন এবং কোনকিছু অত্যাশ্চার্য বিষয় তীর্থযাত্রীদের নজরে পড়ে থাকলে গভীর আগ্রহে শুনতেন তিনি তাঁদের কাছ থেকে। তীর্থভ্রমণের বর্ণনা করা ছাড়াও শাপভ্রষ্ট অপ্সসা আর ফুটন্ত তেলের কথা বললেন রাজাকে বসুমিত্র।

বিক্রমাদিত্য বসুমিত্রের মুখে বিচিত্র সেই অদ্ভুত বিষয়টির কথা শুনে তাঁকে নিয়ে শাপভ্রষ্ট অপ্সরার রাজ্যে গেলেন। রাজা লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরে গিয়ে সেই অপ্সরা মন্মথসঞ্জীবনীকে আর ফুটন্ত তেলের কড়াইটি দেখলেন। তিনি স্নান সেরে শুদ্ধ হয়ে সেই বিরাট কড়াইয়ে ফুটন্ত

তেলের মধ্যে ঝাঁপ দিলেন। উপস্থিত লোকেরা চোখ বুজে ফেলল সে অবর্ণনীয় দৃশ্য দেখে। রাজার শরীর নিমেষে ঝলসে একটা মাংস-পিণ্ডের রূপ নিল।

তারপর এক অলৌকিক ঘটনা ঘটল; অদৃশ্য থেকে সঞ্জীবনীসুধা সিঞ্চিত হল সেই মাংসপিণ্ডে, অমনি রাজা নিজের সুন্দর কান্তি ফিরে পেয়ে তপ্তকটাহ থেকে অক্ষত দেহে নেমে এলেন।

মন্মথসঞ্জীবনী বুঝলেন, এতদিনে তার শাপমুক্তি হল, দিব্যকান্তি ঐশ্বরিক চরিত্রের অধিকারী বিক্রমাদিত্যের হাতেই তার শাপমুক্তি হল। তখন সে কৃতজ্ঞচিত্তে বিক্রমাদিত্যের গলায় মালা দিতে গেল কিন্তু বিক্রমাদিত্য তাকে তার গলায় মালা না দিয়ে পুরোহিতের গলায়ই মালা দিতে বললেন।

মন্মথসঞ্জীবনী বিক্রমাদিত্যের মহান হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে তাঁরই কথামত বসুমিত্রকে বিয়ে করলেন।

বসন্তকালে একবার রাজা বিক্রমাদিত্য বসন্তপূজার আয়োজন করেছিলেন। দেশে সুখশান্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে এবং সর্বসাধারণের মঙ্গলে তিনি এই বসন্তপূজা-অনুষ্ঠান করেছিলেন। বসন্তপূজাকে ঘিরে বসন্তোৎসবের ঢেউ পড়ে যায় সেবার, উজ্জয়িনীতে।

সুবিশাল এক জমকালো মণ্ডপের নীচে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা এবং দেশের জ্ঞানী-গুণী মানুষ থেকে আরম্ভ করে উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে সকল স্তরের মানুষ এমন কি অন্ধববধির পঙ্গু, কুব্জ অসহায় মানুষেরা পর্যন্ত এই উৎসবে সামিল হয়েছিল। দেশ-বিদেশের সুবিখ্যাত গায়ক-গায়িকা নর্তক-নর্তকীদের আহ্বান করে আনা হল উৎসবের আনন্দ কানায় কানায় পূর্ণ করতে।

উৎসব-মণ্ডপে নবরত্নখচিত সিংহাসনটির উপর সোনার লক্ষ্মী-নারায়ণের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হল। কুসুম, কর্পূর, কস্তুরী, চন্দন, অগুরুর পবিত্র গন্ধে, জাতী, যূথী, কুন্দ, মল্লিকা, চম্পক, কেতকী, শতদলের অঞ্জলিসম্ভারে পূজিত হলেন লক্ষ্মী-নারায়ণ ; লক্ষ্মী-নারায়ণকে নিষ্ঠাভরে স্নান করিয়ে ষোড়শপোচারে পূজা করলেন বিক্রমাদিত্য। পূজাশেষে তিনি উপস্থিত সকল ব্রাহ্মণ ও সমবেত কলাকুশলীদের বস্ত্রদানে সম্মানিত করলেন। এরপরে বসন্তরাগের আলাপে গায়ক ও নৃত্যশিল্পীরা বসন্তের স্তুতি করে সঙ্গীত ও নৃত্যানুষ্ঠানের মনোগ্রাহী ব্যবস্থা করলেন। গানবাজনা-নৃত্যের মধ্য দিয়ে বসন্তপূজা ও উৎসেবের সমাপ্তি হলে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রাজার সামনে এসে তাঁর সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনা করে তাঁকে আশীর্বাদ করে বললেন, 'আমি নন্দিবর্ধন নগরের এক ব্রাহ্মণ। আমার আটটি পুত্র, কন্যা ছিল না আমার। একদিন আমি অম্বিকা কালীর কাছে এই সংকল্প করলাম, যদি তাঁর কৃপায় আমি একটি কন্যারত্ন লাভ করি তাহলে মেয়ের নাম দেব অম্বিকা দেবী,

অম্বিকার নামেই মেয়ের নামকরণ করব। দেবীর কাছে আরও সংকল্প করলাম যে, কন্যার বিবাহ উপলক্ষ্যে সমান ওজনের সোনা দান করব উজ্জয়িনীবাসীদের এবং কোনও শাস্ত্রবিদ সুযোগ্য ব্রাহ্মণ-পাত্রের হাতে সম্প্রদান করব তাকে। মেয়ে এখন উপযুক্ত হয়েছে, তার বিয়েরও ব্যবস্থা করেছি ; কিন্তু প্রতিশ্রুতি মতো দানের জন্য অত সোনা যোগাড় করা তো কোনকালেও আমার সাধ্য হবে না। কিন্তু জানি আমি, রাজা বিক্রমাদিত্যের মতো দানশীল ও উদারহৃদয় রাজা যদি আমার সহায় হন, তাহলেই আমার সংকল্প পূরণ করতে পারব।' বিক্রমাদিত্য সঙ্গে সঙ্গে রাজ-কোষাগারিককে হুকুম দিলেন ব্রাহ্মণের প্রয়োজনমতো সোনার তাল রাজ-ভাণ্ডার থেকে এনে ব্রাহ্মণকে দিয়ে দিতে। ব্রাহ্মণ সেই স্বর্ণসম্ভার পেয়ে রাজার জয়গান করে স্বর্ণদানের ব্যবস্থা করে শুভলগ্নে বিয়ে দিলেন মেয়ের।

সপ্তদশ পুতুলের কথা

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে দানবীর ও মহানুভব রাজা বিক্রমাদিত্যের নাম তাঁর জীবিতকালেই শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিল। কোনো এক রাজ্যের রাজার কাছে একবার তাঁর এক অমাত্য বিক্রমাদিত্যের প্রশস্তি করছিল। সেই রাজা তখন তাঁর অমাত্যকে বললেন, 'সকলেই দেখি বিক্রমাদিত্যের স্তুতি করে, অন্য কোনো রাজা আর কি নেই পৃথিবীতে যে বিক্রমাদিত্যের মতো প্রশস্তি পাওয়ার যোগ্য।' তখন অমাত্য তাঁকে বললেন, 'ত্যাগে, উদারতায়, পরোপকারে ধৈর্যে তাঁর মতো রাজা ত্রিভুবনে আর নেই। সাহস, শৌর্য, বীরত্ব, পাণ্ডিত্য, বিদ্যা বুদ্ধিবল অনেকেরই থাকে, কিন্তু যেটা থাকে না, তা হল ত্যাগগুণ, ত্যাগই মহত্তম গুণ, ত্যাগ যে করে সেই প্রকৃত পণ্ডিত আর সেই ত্যাগগুণের সঙ্গে যদি বিদ্যা আর শৌর্য যুক্ত হয় তাহলে তো সোনায় সোহাগা, বিক্রমাদিত্যের চরিত্রে এই ত্রিগুণেরই সমাবেশ দেখা যায়।' অমাত্যের মুখে এসব কথা শুনে রাজার ইচ্ছা হল তিনিও বিক্রমাদিত্যের মতো পরোপকার করবেন।

রাজা ত্যাগব্রত পালনে এক যোগীর কাছ থেকে বিধান নিলেন। যোগীবর রাজাকে কৃষ্ণচতুর্দশীর দিন হোমযজ্ঞ করতে বললেন এবং পূর্ণাহুতি দেওয়ার সময় নিজের শরীরকে আহুতি দিতে বললেন রাজাকে। সেইমতো হোমযজ্ঞ করে অগ্নিতে নিজের শরীর নিবেদন করে পূর্ণাহুতি দিলেন রাজা। দেবতা প্রসন্ন হয়ে অদৃশ্য থেকে রাজাকে নতুন শরীর দান করে তাঁকে বর চাইতে বললেন। রাজা দেবতার কাছে এই বর চাইলেন যে তাঁর ঘরে যে সাতটি মহাকলস আছে, তাতে প্রতিদিন যেন সোনার পূর্ণ থাকে। তখন অলক্ষ্য থেকে দেবতা বললেন, এই ভাবে তিন মাস প্রতিদিন যদি তিনি নিজ দেহকে আহুতি দেন অগ্নিতে, তাহলেই কলসগুলি সবসময়েই সোনায় পূর্ণ থাকবে।

রাজাও দেবতার অভিলাষ অনুযায়ী প্রতিদিনই নিজেকে আহুতি দিতে লাগলেন এবং প্রতিবারই নতুন শরীর লাভ করতে লাগলেন।

রাজা বিক্রমাদিত্য দূতের মুখে এই অত্যাশ্চর্য ঘটনার কথা শুনে নিজেই সেই রাজ্যে গিয়ে নিজের শরীর আহুতি দিলেন যজ্ঞকুণ্ডে। দেবতা অন্তরালে দেকে বুঝলেন মহাপ্রাণ বিক্রমাদিত্য আজ নিজের দেহ বিসর্জন দিলেন যজ্ঞের আগুনে। তাঁকে নতুন শরীর দান করে দেবতা জিজ্ঞেস করলেন, শরীর ত্যাগে তাঁর কি প্রয়োজন? বিক্রমাদিত্য উত্তর দিলেন যে তিনি মানুষের কল্যাণে নিজের জীবনে উৎসর্গ করতে চান। দেবতা তখন বললেন যে তিনি বিশেষ প্রসন্ন হয়েছেন তাঁর প্রতি এবং তিনি যা বর চাইবেন তাই পূর্ণ করবেন। বিক্রমাদিত্য তখন দেবতার কাছে এই অনুগ্রহ চাইলেন যে ঐ রাজাকে বারে বারে আগুনে ভস্মীভূত হয়ে নিয়ত মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করা থেকে যেন অব্যাহতি দেওয়া হয় আর এর সাতটি মহাকলসই যেন নিত্য পূর্ণ থাকে সোনা-দানায়। দেবতা বিক্রমাদিত্যের প্রার্থনা পূরণ করলেন আর সেই রাজা বিক্রমাদিত্যকে মহোত্তম পুরুষ বলে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানালেন।

অষ্টাদশ পুতুলের কথা

উদয়াচল পর্বতে প্রতিষ্ঠিত সূর্যদেবের সুবিশাল মন্দির। গঙ্গা বয়ে যায় তার পাশ দিয়ে। গঙ্গার তীরে 'পাপবিনাশন' নামে শিবমন্দির আছে। সেখানে প্রবহমান গঙ্গার বুক থেকে প্রতিদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে একটি করে স্বর্ণস্তম্ভের আবির্ভাব হয়, তার উপর থাকে এক নবরত্নখচিত সিংহাসন।

উদয়াচলে আবির্ভাবের পর মধ্যাকাশ পর্যন্ত সূর্যের পরিক্রমা-পথে সেই সুবর্ণস্তম্ভ ক্রমশ পূর্ণরূপ নেয় এবং মধ্যাহ্নে গগনচুম্বী রূপ ধারণ করে সূর্যমণ্ডলে প্রবেশ করে; দিনের শেষে সূর্য যখন অস্তাচলে যাত্রা করে তখন সেই স্তম্ভ সূর্যমণ্ডল থেকে আবার প্রকাশ্যে আবির্ভূত হয়ে গঙ্গা-গর্ভে নিমজ্জিত হয়।

এক বিদেশী পর্যটকের মুখে এই কাহিনী শুনে বিক্রমাদিত্য উদয়াচল পর্বতে গিয়ে দেখলেন সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সেই সুবর্ণস্তম্ভের আবির্ভাব হল গঙ্গা-বক্ষে। রাজা সঙ্গে সঙ্গে সাঁতরিয়ে সেই স্তম্ভের উপর বসে পড়লেন। স্তম্ভটি ক্রমশ তাঁকে নিয়ে সূর্যমণ্ডলের দিকে উঠে গেল। সূর্যমণ্ডলের কাছাকাছি যখন গেল স্তম্ভটি, তখন মহা-অগ্নিকুণ্ডের লেলিহান শিখার প্রচণ্ড তাপে রাজার শরীর গলে ঝলসিয়ে একটা দলা মাংসপিণ্ডে পরিণত হল। পিণ্ডাকার দেহ নিয়েই তিনি সূর্যমণ্ডলে প্রবেশ করলেন স্তম্ভের মাথায় স্থির হয়ে। জগতের নয়ন, জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশহেতু, সর্ব-প্রাণ উৎস সবিতাকে প্রণাম জানালেন বিক্রমাদিত্য সূর্যমণ্ডলে প্রবেশ করে।

সূর্যদর্শনের উদ্দেশ্যে বিক্রমাদিত্যের আত্মত্যাগের সংকল্পে বিচলিত হয়ে সূর্যদেব স্বয়ং বিক্রমাদিত্যকে দিব্যদেহ দান করলেন। সূর্যদেব নবরত্নখচিত আপন কুণ্ডল দুটি বিক্রমাদিত্যকে দিয়ে বললেন, 'হে রাজন, এই কুণ্ডল দুটি প্রতিদিন একতাল সুবর্ণ দান করে।' বিক্রমাদিত্য সূর্যদেবকে ভক্তিভরে প্রণাম জানালেন।

তারপর সূর্যদেবের অনুগ্রহে রাজা উজ্জয়িনীতে ফিরে এলেন সশীরের। উজ্জয়িনীতে নিজের প্রাসাদে ফেরার পথে এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে রাজার দেখা হয়ে যায়। সেই ব্রাহ্মণ রাজাকে দাঁড় করিয়ে তার দুঃখের কথা বললেন, গৃহস্থ মানুষ তিনি, ভিক্ষে করেই দিন কাটে, সংসারে অনেক পোষ্য, কারোরই পেট ভরে না। ব্রাহ্মণের এই দুঃখের কথা শুনে বিক্রমাদিত্য তাঁর কান থেকে খুলে কুণ্ডলদুটি তাঁকে দিয়ে বললেন, 'এই কুণ্ডল তোমাকে রোজ একতাল করে সোনা দেবে।' নিত্য স্বর্ণসম্পদের অধিকারী হওয়ার সুযোগ লাভে ব্রাহ্মণ বারে বারে বিক্রমাদিত্যের কাছে তাঁর অন্তরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলেন।

উনবিংশ পুতুলের কথা

একদিন বিক্রমাদিত্য রাজসভায় সিংহাসনে বসে আছেন, এমন সময় এক ব্যাধ এসে রাজাকে প্রণাম করে বলল, নদীর পাড়ে এক কুঞ্জবনে এক ভয়ঙ্কর প্রকৃতির বিরাট শূকরকে দেখলাম। তাকে হত্যা না করলে রাজ্যের লোকের সমূহ বিপদ হবে। বিক্রমাদিত্য তা শুনে লগুড় নিয়ে ব্যাধের সঙ্গে সেই কুঞ্জবনের কাছে গেলেন। সেই ভয়ঙ্কর শূকরটির কাছে রাজা সাহসভরে এগিয়ে তাকে আক্রমণ করার কোন সুযোগ না দিয়েই লগুড়ের বারি মারতে লাগলেন তার পিঠে ক্রমাগত। শূকরটি সেই লগুড়াঘাতকে সমীহ না করে কাছেই এক পাহাড়ের গুহায় ঢুকে পড়ল, রাজাও তার সঙ্গে সঙ্গে সেই গুহার মধ্যে ঢুকে পড়লেন, গভীর অন্ধকারের মধ্যে কিছুটা পথ গিয়ে আকস্মিক এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এসে পড়লেন। সোনার পাঁচিলে ঘেরা আলোকিত এক অপরূপ নগর তাঁর চোখে পড়ল, সারবন্দী শ্বেত পাথরের প্রাসাদ নগরটিকে রমণীয় করে তুলেছে।

সেই নগরের স্বর্ণমণ্ডিত তোরণ দিয়ে ঢুকে রাজা নগর পরিক্রমা করে দেখলেন, সেখানে দেবালয়, সুগজ্জিত বিপণি আর প্রমোদ-নিকেতন রয়েছে কত। সুরম্য রাজপ্রাসাদটির দিকে বিশেষভাবে নজর পড়ল তাঁর। রাজভবনে ঢুকতেই দ্বারী তাঁর পরিচয় জেনে রাজা বলিকে খবর দিল। বলি খবর পাওয়ামাত্র নিজে এসে বিক্রমাদিত্যকে সাদর অভ্যর্থনা করলেন। রাজগৃহে নারায়ণের মন্দিরে নিয়ে গেলেন তাঁকে প্রথমে।

বলি বিক্রমাদিত্যকে বললেন, 'বহু পুণ্যের ফলে আজ আপনার দর্শন পেয়েছি। আমার আলয়ে আপনার শুভাগমনে ধন্য হলাম আজ।' বিক্রমাদিত্য বললেন তাঁকে, তাঁর জীবন সার্থক, কেননা বৈকুণ্ঠের অধিপতি নারায়ণ স্বয়ং রাজা রাণীর প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে নিত্য অধিষ্ঠান

করছেন। এরপর বলি বললেন তাঁকে, 'যেহেতু রাজন, আপনি আমার পরম শ্রদ্ধার পাত্র ও অকৃত্রিম মিত্র, আমি আপনাকে দুটি জিনিস উপহার হিসেবে দেব।' বিক্রমাদিত্য তখন বললেন, 'রাজন, আপনাদের আশীর্বাদে আমার অভাব নেই কোনো। আপনাদের শুভেচ্ছায় জীবন আমার পরিপূর্ণ।' বলি সেকথার পিঠে বললেন, 'উপকার না করলে মানুষের মধ্যে প্রীতির বন্ধন দৃঢ় হয় না। রাজন, আপনার অভাব আছে, এ প্রশ্নই আসে না ; মৈত্রীর নিদর্শন হিসেবেই দিতে চাইছি এই দুটি জিনিস আপনাকে।' বিক্রমাদিত্য এবার রাজী হলেন জিনিস দুটি নিতে। বলি বিক্রমাদিত্যকে রস ও রসায়নের দুটি পাত্র দিয়ে বললেন, 'এই রসের সংস্পর্শে সাত ধাতু সোনায় পরিণত হয় এবং এই রসায়ন যদি সেবন করে কেউ, তাহলে সে জরামৃত্যুর হাত থেকে মুক্তি পাবে চিরতরে।" বিক্রমাদিত্য ঐ দুটি জিনিস আগ্রহে গ্রহণ করে রাজা বলির কাছে বিদায় নিয়ে উজ্জয়িনীতে ফিরে এলেন। পথে এক দীনদুঃখী ব্রাহ্মণ তাঁর তরুণবয়স্ক রুগ্ন পুত্রের হাত ধরে রাজার কাছে সাহায্যভিক্ষা চাইলেন। রাজা সেই রস ও রসায়নের গুণ বর্ণনা করে সেই দুঃস্থ ব্রাহ্মণকে বললেন, যে কোন একটি নিতে পারেন তিনি। ব্রাহ্মণ রসায়ন গ্রহণের পক্ষপাতী হলেন, জরামৃত্যুর হাত থেকে চিরতরে রক্ষা পাবার জন্য। কিন্তু তাঁর পুত্র বলল, সে অমর জীবনে লাভ কি, যে জীবনে প্রতি-মুহূর্তে অভাব অনটনে, অর্ধাহারে অনাহারে কাটে নিয়ত! স্বর্ণভাণ্ডার থেকে অগাধ ধনদৌলত গড়ে উঠবে আমাদের, ঐ 'রস' গ্রহণ করলে ; যত-দিন বাঁচব, সংসারে লক্ষ্মী অচঞ্চল থাকবে। 'রস' গ্রহণ করাই ঠিক।'

বিক্রমাদিত্য পিতা-পুত্রের অভিলাষ শুনে দুটি জিনিসই ব্রাহ্মণকে দান করে পরিতৃপ্তমনে প্রাসাদে ফিরে গেলেন।

পদ্মালয় নগর থেকে বারো যোজন দূরে মহারণ্যে আকাশচুম্বী এক পর্বতে যোগীশ্বর ত্রিলোকনাথ থাকেন। তাঁর দর্শন লাভ করতে পারলে বাঞ্ছিত বস্তু লাভ করা যায়। বিক্রমাদিত্য সাধু-সন্তদের কাছ থেকে এই সুসমাচার পেয়ে মহারণ্যের দুর্গম পথে পাড়ি দিয়ে ত্রিলোকনাথের পাহাড়ের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন ঐ যোগীশ্বরের দর্শন লাভে। পথে ভয়ঙ্কর প্রকৃতির এক সাপ তাঁর পথরোধ করে দাঁড়াল। রাজা সাপকে দেখেও অবিচলিত মনে, নির্ভয়ে নির্বিকারভাবে এগিয়ে চললেন। সেই সাপ ছুটে এসে ছোবল মারল বিক্রমাদিত্যের পায়ে। বিক্রমাদিত্য যন্ত্রণায় ছটফট করলেও সঙ্গে সঙ্গে দংশন-ক্ষতের ওপর দিকে পায়ে কাপড়ের বেড় দিয়ে শক্ত করে বাঁধলেন। পায়ের যন্ত্রণা সত্ত্বেও অদম্য মানসিক শক্তি নিয়ে তিনি গহন বন পাড়ি দিয়ে সেই দুর্গম পাহাড়ের ঝোপজঙ্গলে ঘেরা এবড়ো খেবড়ো খাড়া পথ ধরে উঠে গেলেন ত্রিলোকনাথের আশ্রমে। ত্রিলোকনাথ-যোগীকে দর্শন করা মাত্র সর্পবিষের যন্ত্রণা দূর হল নিমেষে তাঁর শরীর থেকে, ক্ষতচিহ্নটি কখন যে মিলিয়ে গেল, রাজা বুঝতেই পারলেন না।

যোগীরাজ রাজাকে জিজ্ঞেস করলেন এই দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে এত যন্ত্রণা-ক্লেশ সহ্য করে কেন তিনি তাঁর কাছে এসেছেন। মানুষের অগম্য এই শ্বাপদ-সংকুল জায়গায় কি আশায় এসেছেন তিনি জানতে চাইলেন। বিক্রমাদিত্য বললেন, তাঁকে দর্শন করা ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য নেই তাঁর। যোগীরাজ তখন অন্তরঙ্গ সুরে বললেন, 'আসতে খুবই কষ্ট হয়েছে, তাই না!' রাজা উত্তর দিলেন, 'আপনাকে দর্শন করা মাত্রই আমার সব কষ্ট দূর হয়েছে! আপনার মতো মহাপুরুষ দর্শন মহাভাগ্যের ব্যাপার; আমি প্রকৃতই ভাগ্যবান যে আপনার দর্শন পেয়েছি।' রাজার অন্তরের ঐশ্বর্যে মুগ্ধ ও প্রসন্ন হয়ে যোগীশ্বর রাজাকে

একটি খুঁটি, একটি যোগদণ্ড ও একখানি কাঁথা প্রদান করে এ.কে একে তাদের গুণ-বৈশিষ্ট্যের কথা বললেন। খুঁটিটা দিয়ে ভূমিতে যতগুলি রেখা টানা যায় একদিনে, তত যোজন পথ অনায়াসে যাওয়া যায়। যোগদণ্ডটি ডান হাতে ধারণ করলে মৃত সৈন্য প্রাণ ফিরে পায়, আর বাম হাতে যদি সেটা ধারণ করা হয় তাহলে বিপক্ষের সব সৈন্যের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি হয় ; কাঁথাটি প্রার্থিত বস্তু দান করে।

রাজা ঐ তিনটি জিনিস নিয়ে দুর্গম পাহাড় আর জঙ্গলের পথ অতিক্রম করে দেশে ফিরে যাচ্ছিলেন যখন, লোকালয় আর জঙ্গলের সীমানায় দাঁড়িয়ে এক ব্যক্তিকে দেখলেন স্তূপীকৃত কাঠে অগ্নিসংযোগ করতে। কি কারণে সে এই কাজ করছে ? —রাজার এই প্রশ্নে সেই রুগ্ন অথচ সুশ্রী মানুষটি বলল যে সে এক রাজার ছেলে ; তার জ্ঞাতিভাইরা তাঁর পিতাকে তাকে হত্যা করে রাজ্যচ্যুত করেছে ; সেএখন নিঃস্ব রিক্ত হয়ে জীবনের দুঃখ-কষ্ট থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য আগুনে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছে। রাজা তাকে নিবৃত্ত করে সেই খুঁটি, লাঠি ও কাঁথা দিয়ে দিলেন।

রাজকুমার বিক্রমাদিত্যের এই স্বতঃস্ফূর্ত নিষ্কাম দানকাজের জন্য কৃতজ্ঞতায় অব্যক্ত হয়ে রইলেন ; পরোক্ষভাবে বিক্রমাদিত্যই তাঁকে রাজ-আসনে বসার পথ প্রশস্ত করে দিলেন।

একবিংশ পুতুলের কথা

বিক্রমাদিত্যের বুদ্ধিসুদ্ধি নামে এক মন্ত্রী ছিল ; তাঁর ছেলে, অনর্গল বুদ্ধিহীন নিরেট প্রকৃতির ছিল। পিতা তাকে একদিন বংশের কুলাঙ্গার বলে ভৎ'সনা করে দুঃখ করলেন যে অজাত, মৃত ও মূর্খ পুত্রের মধ্যে মৃত ও অজাত পুত্র তবু ভাল, কিন্তু মূর্খ পুত্রকে সহ্য করা বিষম ব্যাপার, কেননা মূর্খ যতদিন বাঁচে, ততদিনই সে মানসিক অশান্তি সৃষ্টি করে, যেখানে মৃত এবং অজাত বা আকাঙ্ক্ষিত পুত্রের ক্ষেত্রে মনের যন্ত্রণা ততটা নয়। পিতার এই কথায় ব্যথিত হয়ে অনর্গল সংসার-ত্যাগী হয়ে অন্য এক রাজ্যে চলে গেল। সেখানে এক আচার্যের নিকট সকল নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করে কিছুকাল পরে দেশ-অভিমুখে রওনা হলেন। পথে এক মন্দির-সংলগ্ন পদ্মশোভিত এক নির্মল স্বচ্ছ সরোবর আকৃষ্ট করল তাকে। সেই সরোবরের একাংশের জল ছিল বেশ উত্তপ্ত। সেই মনোরম ও রহস্যময় সরোবরের পাড়ে বসে পড়লেন অনর্গল। ক্রমশ দিনের আলো অস্পষ্ট হয়ে এল। অস্তমিত সূর্যের রক্তিম আভা পশ্চিম আকাশে স্থির হয়ে রইল, ক্রমশ তাও ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর রূপ নিয়ে দিগন্তে মিলিয়ে গেল। অনর্গল তখনও বসে আছে নিবিষ্টমনে। রাত বেড়ে চলে, অনর্গলের ওঠার কোন লক্ষণ নেই। মাঝরাতে অনর্গল এক অলৌকিক দৃশ্য ছাখে, অচিন্তিত ছিল সে দৃশ্য তার কাছে। সরোবরের সেই তপ্ত জলের মধ্য থেকে আটজন দিব্যরমণী বেরিয়ে এসে নন্দিরে গিয়ে যোড়শপোচারে দেবতার পুজা সম্পন্ন ক'রে, দেবতাকে সঙ্গীত ও নৃত্য কলাবিদ্যা প্রদর্শনে তুষ্ট ক'রে দেবতার স্বহস্ত থেকে প্রসাদ লাভ করলেন। প্রভাতে তাঁরা সেই তপ্তজলের মধ্যে নিমজ্জমান হওয়ার আগে অনর্গলকে দেখতে পেয়ে তাকে তাঁদের সঙ্গে সেই জলের অতলান্ত গভীরে পাতালে যাওয়ার প্রস্তাব দিলেন। কিন্তু অনর্গল তাদের সে কথায় সাড়া না দিয়ে ভয়ে নিঃসাড় হয়ে বসে রইল।

তারপর অনর্গল উজ্জয়িনীতে ফিরে এসে পিতার কাছে নিজের শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় দিলে, আনন্দে জড়িয়ে ধরলেন তার পিতা তাকে। তার পিতা বুঝলেন ছেলেকে তাঁর ভর্ৎসনা করা বিফল হয় নি। বিক্রমাদিত্যের সঙ্গেও দেখা করল সে ; বিক্রমাদিত্য অসীম কৌতূহল নিয়ে সেই দিব্যরমণীদের সম্পর্কে সব শুনলেন অনর্গলের মুখ থেকে।

বিক্রমাদিত্য অনর্গলকে নিয়ে সেই সরোবরের পাড়ে এসে পৌঁছলেন একদিন রাতে। নিরালায় সরোবরের পাড়ে বসে রাজা দিব্যরমণীদের আবির্ভাব ও পূজার্চনা এবং নৃত্য-গীত অনুষ্ঠান দেখলেন স্বচক্ষে ; প্রত্যুষে যখন দিব্যরমণীরা বিদায়কালে তপ্তজলে প্রবেশ করতে যাচ্ছিলেন তখন তাঁরা রাজাকে দেখে তাঁকে তাঁদের সঙ্গে আসতে বললেন। রাজী হয়ে গেলেন বিক্রমাদিত্য ; দিব্যরমণীদের সঙ্গে সেই তপ্তজলে প্রবেশ করে সপ্ত-পাতালে তাঁদের আবাসস্থলে এসে পৌঁছলেন তিনি।

সেখানে এসে দিব্যরমণীরা তাঁদের পরিচয় দিল, তাঁরাই অষ্টসিদ্ধি। রাজাকে তাঁরা অনন্য মহাপুরুষ হিসাবে গণ্য করে তাঁকে অষ্টসিদ্ধি দান করলেন।

আটটি রত্ন নিয়ে রাজা যখন ফিরছিলেন তখন পথে এক ব্রাহ্মণ তাঁকে দাঁড় করিয়ে আশীর্বাদ জানিয়ে বললেন, 'আমি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। কিন্তু ক্ষুণ্নিবৃত্তির এমনই জ্বালা যে নিজের পাণ্ডিত্যকে অভিশাপ জানাতে ইচ্ছা করছে ; জানেনই তো, অর্থ ছাড়া জীবনের মূল্য নেই, সেই অর্থই যদি আমার না থাকল, জীবনধারণ করবই বা আমি কি করে ? অর্থ ব্যতীত পণ্ডিতেরও কোন মর্যাদা নেই সমাজে !'

রাজা ব্রাহ্মণের কথা শুনে করুণার্দ্র হয়ে দিব্যরমণীদের কাছ থেকে পাওয়া আটটি রত্নই তাঁকে দিয়ে দিলেন। সেই ব্রাহ্মণ রাজার প্রশস্তি-বচন করতে করতে নিজ নগরে চলে গেলেন। রাজাও এই পুণ্যকাজ করে তৃপ্তমনে উজ্জয়িনীতে ফিরে এলেন।

দ্বাবিংশ পুতুলের কথা

বিক্রমাদিত্য একবার পৃথিবী পর্যটনে বেরিয়ে নানা তীর্থ, দেবমন্দির, নগর, পর্বত, নদী, সরোবর পর্যবেক্ষণ করতে করতে বর্ণাঢ্য ঐশ্বর্যমণ্ডিত এক নগরে এসে পড়লেন। নগরের প্রাসাদগুলি অপূর্ব কারুকার্যময়। নগরের মধ্যে রয়েছে বহু শিবালয় ও বিষ্ণুমন্দির। নিকটস্থ সরোবরে স্নান করে পরিশুদ্ধ হয়ে শ্রীহরিকে রাজা অন্তরের শ্রদ্ধার্ঘ জানিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। শ্রীহরির মন্দির-সংলগ্ন নাটমন্দিরের এক ব্রাহ্মণকে দেখতে পেয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, কোথা থেকে এসেছেন তিনি। ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন, তিনি তীর্থযাত্রী, পৃথিবী পর্যটনে বেরিয়েছেন। রাজার প্রশ্নটাই তারপর ব্রাহ্মণ উলটে রাজাকে ছুঁড়ে দিলেন। রাজা বললেন, তিনিও পৃথিবী পর্যটনে বেরিয়েছেন। তখন ব্রাহ্মণ বললেম, তাঁর চেহারা দেখে তো মনে হয় তিনি কোনও রাজবংশের লোক, সমস্ত রাজলক্ষণই তাঁর মধ্যে রয়েছে বললেন ব্রাহ্মণ। রাজকার্য ছেড়ে কেন তিনি পৃথিবী পর্যটন করছেন জিজ্ঞেস করলেন ব্রাহ্মণ। রাজা ব্রাহ্মণের অন্তর্দৃষ্টির কাছে ধরা দিলেন। তিনি নিজের পরিচয় দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ব্রাহ্মণেকে, কেন তাঁকে এত শ্রান্ত ক্লান্ত দেখাচ্ছে। ব্রাহ্মণ বললেন রাজাকে, 'শুনুন তবে আমার কথা। কাছেই নীল নামে এক পাহাড়ে অধিষ্ঠান করেন দেবী কামাক্ষী; সেখানে পাতাল-প্রবেশের জন্য একটি গহ্বর আছে, কিন্তু সে বিবরের মুখ বন্ধ। কামাক্ষী-মন্ত্র জপ করলেই সে গহ্বর উন্মুক্ত হয়। তার মধ্যে রয়েছে রসের কুণ্ড, এই রসের সংস্পর্শে এলে অষ্ট ধাতু স্বর্ণে পরিণত হয়। বারো বছর ধরে কামাক্ষী মন্ত্র জপ করেও সে রসলাভ করতে পারি নি।' ব্রাহ্মণের সাধনার সিদ্ধির জন্য রাজা নিজের ঘাড়ের কাছে যেই তরোয়াল তুলে ধরলেন আত্মবিসর্জনের জন্য, অমনি দেবী আবির্ভূত হয়ে তাঁকে বললেন, 'তোমার প্রতি আমি খুবই প্রসন্ন হয়েছি। তুমি যা বর চাইবে, তাই

পূর্ণ করা হবে।' রাজা বললেন, 'হে কামাক্ষী দেবী, আমার প্রতি যদি আপনার এতই অনুগ্রহ, তাহলে ব্রাহ্মণকে রস-কুম্ভ প্রদান করুন।'

দেবী 'তথাস্তু' বলে গহ্বর-দ্বার উন্মুক্ত করে রস-কুম্ভ এনে দিলেন ব্রাহ্মণকে। ব্রাহ্মণের হৃদয় বিক্রমাদিত্যের প্রতি কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হয়ে গেল।

ত্রয়োবিংশ পুতুলের কথা

শেষ রাতে একবার বিক্রমাদিত্য স্বপ্নে দেখলেন, তিনি স্বয়ং মহিষের পিঠে আরোহণ করে দক্ষিণ দিকে চলেছেন। প্রত্যুষে ঘুম থেকে জেগে উঠেই সেই স্বপ্নের কথা মনে হলে অকল্যাণ দূর করার প্রার্থনা জানিয়ে তিনি বিষ্ণুকে স্মরণ করে প্রণাম করলেন, তাঁর আশঙ্কা হল স্বপ্নে মহিষের পিঠে চড়া বোধ হয় অমঙ্গলজনক।

সেদিনের রাজসভায় সভাসদদের কাছে তাঁর স্বপ্নের বৃত্তান্ত বললেন। তা শুনে শাস্ত্রবিদ ব্রাহ্মণ সর্বজ্ঞভট্ট বললেন, স্বপ্ন দুইরকম। স্বপ্নে গোপৃষ্ঠে বা বৃষ বা হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ, কিংবা বনস্পতি-শীর্ষে আরোহণ, প্রাসাদে প্রবেশ, রোদন, মৃত্যু, ছত্র, চামর, সমুদ্র, গঙ্গা, পতিব্রতা নারী, শঙ্খ, স্বর্ণ প্রভৃতি দর্শন শুভ। আর অশুভ স্বপ্ন হল—মহিষ বা গর্দভপৃষ্ঠে আরোহণ, কণ্টকবৃক্ষে আরোহণ এবং ভস্ম, কার্পাস, ধূম, বাঘ, শূকর, বানর দর্শন।

স্বপ্নের তাৎপর্যের কথা শুনে রাজার মনে তো ভীষণ প্রতিক্রিয়া হল। এই দুঃস্বপ্ন দেখার ফলে যে অকল্যাণ হবে, তার প্রতিবিধান করা কিভাবে সম্ভব, রাজা জানতে চাইলেন সে বিষয়ে, সর্বজ্ঞভট্টের কাছে। সর্বজ্ঞভট্ট রাজাকে বললেন, 'আপনি স্নান করে শুদ্ধ হয়ে যজ্ঞানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করুন। যজ্ঞাগ্নি প্রদক্ষিণ করে বস্ত্র ও অলঙ্কার দান করুন ব্রাহ্মণদের। তারপর বস্ত্র পালটিয়ে দেবতার অভিষেক পূজার পর ব্রাহ্মণদের গাভী, ধান প্রভৃতি দশ প্রকার দ্রব্য দান করুন এবং রাজ্যের সকল দুঃস্থ, অন্ধ, বধির, পঙ্গু, কুব্জ, অনাথ মানুষদের পর্যাপ্ত দান করুন। এই সব পুণ্যকাজ করলেই আপনার দেখা দুঃস্বপ্ন থেকে সম্ভাব্য অনিষ্ট দূর হয়ে যাবে।'

রাজা সর্বজ্ঞভট্টের উপদেশ অনুযায়ী যাগযজ্ঞ করে অকাতরে দান-ধ্যান করলেন নিজের ও রাজ্যের সম্ভাব্য অমঙ্গল নিবারণে।

চতুর্বিংশ পুতুলের কথা

পুরন্দরপুরীতে এক ধনী বণিক বাস করতেন। প্রৌঢ়বয়সে তিনি তাঁর চার পুত্রকে ডেকে বললেন যে তাঁর মৃত্যুর পর চারজন যে একত্রে মিলেমিশে থাকতে পারবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই, তাদের মধ্যে যাতে ঝগড়াঝাটি অসদ্ভাব না দেখা দেয় তার জন্যে তিনি ঠিক করেছেন যে তাঁর সম্পত্তি বড়ো-ছোটো অনুসারে তাদের মধ্যে ভাগ করে দেবেন। তিনি তাদের বললেন যে তাঁর সমগ্র ধনসম্পত্তি চার ভাগ করে নির্দেশনামা খাটের তলায় সযত্নে রেখে দিয়েছেন, তাঁর মৃত্যুর পর তারা যেন সেই নির্দেশ দেখে সম্পত্তি ভাগাভাগি করে নেয়।

বণিকের মৃত্যু হলে চার ভাইয়ের স্ত্রীদের মধ্যে সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে মাঝে মাঝেই ঝগড়াঝাটি হত। তখন চার ভাই এই অহেতুক ঝগড়া বন্ধ করার জন্য পিতার ভাগনির্দেশ অনুযায়ী সম্পত্তি ভাগ-বাটোয়ারা করার সিদ্ধান্ত নিল। খাটের তলায় যেখানে নামে নামে সম্পত্তি ভাগ করে নির্দেশনামা রাখা ছিল, সেখানে তারা খুঁজে-পেতে শুধু চারটি ছোট কৌটো দেখতে পেল। প্রথম কৌটোয় রয়েছে মাটি, দ্বিতীয়টিতে অঙ্গার, তৃতীয়টিতে অস্থি এবং চতুর্থটিতে খড়। এই চারটি কৌটোর মধ্য দিয়ে তাদের পিতা কিভাবে তাদের মধ্যে ধনবণ্টনের পরিকল্পনা করেছিলেন, বুঝতে পারল না তারা অনেক গবেষণা করেও। তারা তখন উজ্জিয়নীসহ দেশে দেশে পণ্ডিতদের কাছে এবং এক রাজদরবার থেকে অন্য রাজদরবারে ঘুরে ঘুরে খোঁজ করতে লাগল যদি কেউ এই রহস্যের সমাধান করতে পারে। অবশেষে কুমোরপাড়া নগরের রাজা শালিবাহন সেই বৃত্তান্ত শুনে নিজেই তাঁর কাছে তাদের ডেকে এনে বিষয়টির সমাধান করে দিলেন—জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বণিক দিয়েছেন মাটি অর্থাৎ ধানখেত ছাড়া যে'সকল ভূসম্পত্তি তাঁর ছিল তা সবই জ্যেষ্ঠ পুত্রকে দিয়েছেন। দ্বিতীয় পুত্রের জন্য রাখা হয়েছে

খড় অর্থাৎ বণিকের মালিকানাভুক্ত সকল ধানখেত দেওয়া হয়েছে দ্বিতীয় পুত্রকে। তৃতীয় জনের ভাগে পড়েছে অস্থি অর্থাৎ বণিকের গৃহপালিত সকল জন্তু তৃতীয় পুত্রের কর্তৃত্বে এসেছে। চতুর্থ বা কনিষ্ঠ পুত্রের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে অঙ্গার অর্থাৎ বণিকের সকল ধনসম্পাদ।

এর কিছুদিন পরে শালিবাহনের রাজ্য শত্রুপক্ষের সৈন্যদের দ্বারা অবরুদ্ধ হন। শালিবাহন যুদ্ধে পর্যুদস্ত হয়ে শেষনাগকে স্মরণ করলে যুদ্ধক্ষেত্রে সাপদের পাঠালেন শেষনাগ। তারা এসে শালিবাহনের শত্রু-সৈন্যদের দংশন করল। সর্পদষ্ট সৈন্যরা মূর্ছিত হয়ে পড়ে রইল রণাঙ্গনে।

এই খবর বিক্রমাদিত্যের কাছে পৌঁছবামাত্র তিনি দিনের পর দিন বাসুকি-মন্ত্র জপ করতে থাকেন। বাসুকি অবশেষে বিক্রমাদিত্যের উপর প্রসন্ন হয়ে তাঁর সামনে আবির্ভূত হয়ে জানতে চাইলেন, তাঁর কি বরের প্রয়োজন। বিক্রমাদিত্য মূর্ছিত সেই সৈন্যদের জ্ঞান ফিরে পাওয়ার জন্য অমৃত-ঘট চাইলেন। বাসুকি প্রসন্নমনে তাঁকে অমৃত-ঘট দিয়ে অদৃশ্য হলেনা।

বিক্রমাদিত্যের অমৃত-ঘট প্রাপ্তির খবর ত্বরিতে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। এক ব্রাহ্মণ রাজসভায় এসে রাজার প্রতি আশীর্বাণী উচ্চারণ করে অমৃত-ঘটটির ব্যাপারে খুবই কৌতূহল দেখলেন। ব্রাহ্মণ বললেন রাজার কাছে প্রার্থীত জিনিস না পেয়ে কেউই ফিরে যায় না। রাজা ব্রাহ্মণকে বললেন, আপনিও আমার কাছে যা প্রত্যাশা করবেন, নিশ্চয়ই পাবেন। ব্রাহ্মণ তখন অমৃত-ঘটটি তাঁকে দেবার জন্য প্রার্থনা জানালেন। রাজা ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞেস করলেন, তাঁকে কে পাঠিয়েছে। ব্রাহ্মণ বললেন, তাঁকে শালিবাহন পাঠিয়েছেন। বিক্রমাদিত্য বুঝলেন শালিবাহনের হাতে এটা পড়লে আর তাঁর পক্ষে শালিবাহনের শত্রু সৈন্যদের জ্ঞান ফেরানো সম্ভব হবে না। কিন্তু তিনি যে ব্রাহ্মণের কাছে প্রিতশ্রুতিবদ্ধ যে যা তাঁর ঈপ্সিত, তাই তাঁকে তিনি দেবেন। এঁকে যদি ঘটটি এখন না দেন তাহলে তাঁর নিজের অপযশ ও অধর্ম হবে; তাই আর দ্বিধা না করে বিক্রমাদিত্য অমৃত-ঘটটি ব্রাহ্মণকে দিয়ে দিলেন।

ব্রাহ্মণ মহানন্দে অমৃত-কুম্ভ নিয়ে বিক্রমাদিত্যের স্তুতি করতে করতে শালিবাহনের কাছে চলে গেলেন।

পঞ্চবিংশ পুতুলের কথা

গ্রীষ্মের শেষে একদিন এক জ্যোতিষী বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে দেখা করে বললেন, 'রাজা সাবধান হোন, বার বছর ধরে ঘোর অনাবৃষ্টি চলবে দেশে, খেত মরামাঠে পরিণত হবে। দেশে দুর্ভিক্ষ ছেয়ে যাবে। গ্রহাদির যা অবস্থান এখন তাতে করে এই অনাবৃষ্টি রোধ করা দুরূহ ব্যাপার। সূর্যপুত্র শনি এবার রোহিনী-যোগ ত্যাগ করবে, তাই বারো বছর ধরে বৃষ্টি হবে না।' রাজা তা শুনে শঙ্কিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এই অনাবৃষ্টি রোধের কোন উপায় আছে কি? জ্যোতিষী রাজাকে গ্রহ-শান্তির জন্য গ্রহ-হোম অনুষ্ঠান করতে বললেন।

গ্রহ-শান্তির জন্য বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের দিয়ে রাজা যাগ-যজ্ঞ করালেন নিষ্ঠার সঙ্গে। যজ্ঞশেষে অন্ন-বস্ত্র ও নানা দ্রব্যসামগ্রী দিয়ে ব্রাহ্মণদের তুষ্ট করলেন তিনি; দীনদরিদ্র, অন্ধ, বধির পঙ্গু অসহায় মানুষদের অকুণ্ঠ-দানে তুষ্ট করলেন, কিন্তু এত করেও দেশে বৃষ্টি হল না।

কয়েকদিন পর রাজা দৈববাণী শুনলেন যে উজ্জয়িনীর মন্দিরের দেবতার কাছে যদি বত্রিশ লক্ষণযুক্ত মানুষের ছিন্ন-মস্তক নিবেদন করা হয় তাহলেই দেশে বর্ষা নামবে। রাজা তখনই মন্দিরে গিয়ে তরোয়াল দিয়ে নিজের গলায় কোপ দিতে গেলেন, কিন্তু দেবতা তার সামনে আবির্ভূত হয়ে তাকে সে কাজ থেকে নিবৃত্ত করে বললেন, 'বিক্রমাদিত্য, তোমার ধৈর্যগুণ ও ত্যাগধর্মে আমি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। আমার কাছে বর চাও তুমি।' তখন বিক্রমাদিত্য দেবতাকে বললেন, 'দেশে অনাবৃষ্টি দূর করুন, হে দেব!' দেবতা 'তথাস্তু' বলে অদৃশ্য হলেন। বৃষ্টি নামল সঙ্গে সঙ্গে, বর্ষাঋতুর আবির্ভাব সূচনা ক'রে।

ষড়বিংশ পুতুলের কথা

রাজা বিক্রমাদিত্যের মতন কীর্তিমান, পরোপকারী, ও মহাত্মন পুরুষ পৃথিবীতে এক বিস্ময়, নারদের এই কথায় দেবরাজ ইন্দ্র মর্তের এই মহাপ্রাণ মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য নিজের গাভী সুরভীকে (কামধেনু) মর্তে পাঠালেন।

উজ্জয়িনীর রাজপথে বিক্রমাদিত্যকে একদিন দূর থেকে দেখতে পেয়ে সুরভী পথের ধারে সঙ্কীর্ণ নর্দমার মধ্যে ইচ্ছে করেই পড়ে গিয়ে পাঁকের মধ্যে গড়াগড়ি খেয়ে নিল। সারা শরীরটা তার পাঁকে থকথক করতে লাগল। রাজা চলতে চলতে থেমে পড়ে নর্দমায় পড়ে থাকা গাভীটিকে তোলার জন্য অনেক চেষ্টা করলেন। পরে তিনি লোকজন ডেকে এনে গাভীটিকে তুলে ভাল করে স্নান করিয়ে মাঠে ছেড়ে দিতে গেলেন। গাভীটি রাজার মহত্ত্ব দেখে নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, 'আমি স্বর্গগাভী সুরভী, আমিই কামধেনু, আপনার মহান চরিত্রগুণ প্রত্যক্ষ করতে এসেছি মর্তে। আপনার মত মানুষ পৃথিবীতে সুদুর্লভ। আপনার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি আমি। আপনি যে বর চাইবেন আমার কাছে, আমি তাই প্রসন্ন মনে দেব আপনাকে। বিক্রমাদিত্য তখন বললেন, 'আপনার আশীর্বাদে আমার কোন অভাব নেই, আমার কিছুই চাওয়ার নেই।' তখন সুরভী রাজাকে বলল, 'বেশ, 'তাহলে আমি আপনার কাছেই থাকব।' 'কামধেনুকে নিয়ে রাজা মহানন্দে প্রাসাদের দিকে চললেন। পথে এক ব্রাহ্মণ রাজাকে আশীর্বাদ করে বললেন, 'রাজা বিক্রমাদিত্য গরীব দুঃখীরপালক। আমি অত্যন্ত দুঃস্থ, আপনার কাছে সাহায্য প্রত্যাশা করি।' ব্রাহ্মণ একটু থেমে আবার বললেন, 'রাজা, আমার ঘরে চির-অশৌচ, চির দারিদ্র্যের জন্য ; আমি আমার চারিদিকের মানুষদের সম্পর্কে সচেতন কিন্তু আমি সকল মানুষের কাছে অজ্ঞাত থেকে গেলাম আমার অবহেলিত, মূল্যহীন

জীবনের জন্য। তাই মহারাজা, দারিদ্র্য থেকে চিরতরে মুক্তি দিন আমাকে।' তখন রাজা ব্রাহ্মণের দুঃখে অভিভূত হয়ে তাকে সেই কামধেনুটি দান করে দিলেন। ব্রাহ্মণ কামধেনুকে পেয়ে আনন্দে বিভোর হয়ে রাজার জয়ধ্বনি করতে করতে সেটিকে নিয়ে বাড়ী চলে গেল।

সপ্তবিংশ পুতুলের কথা

রাজা বিক্রমাদিত্য ছদ্মবেশে একবার দেশ ভ্রমণে বেরিয়ে এক নগরে ঘুরতে ঘুরতে সুরম্য এক মন্দিরে ঢুকে দেব-মূর্তি দর্শন করলেন। দেব-মূর্তিকে প্রণাম করে তিনি নাটমন্দিরে বসে পড়লেন বিশ্রামের জন্য। অল্পক্ষণের মধ্যে সেই নাটমন্দিরে একজন সুদর্শর সুবেশী যুবাপুরুষ তার কয়েকজন ইয়ারবন্ধুকে নিয়ে নাটমন্দিরে বসে কিছুক্ষণ হৈ-হল্লা গল্পগুজব করে চলে গেল। রাজা মন্দিরের মধ্যে সেই যুবাপুরুষ ও তার বন্ধুদের প্রগলভ আচরণ দেখে বিস্মিত হলেন খুবই মনে মনে।

পরের দিনও রাজা সেই নাটমন্দিরে এসে বসলেন। তিনি সবিস্ময়ে দেখলেন, আগের দিন যে যুবকটি তার বন্ধুদের নিয়ে এসে হৈ-হল্লা করছিল এই মন্দিরে, সেই লোকটি আজ জীর্ণ পোশাক পরে নাট-মন্দিরের এক কোণায় বিমর্ষমনে বসে আছে।

যুবকটির কাছে গিয়ে রাজা জিজ্ঞেস করলেন তাকে, এমন হাল কেন তার আজ? আগের দিন তো সে এসেছিল জমকালো পোশাক পরে ফুর্তির মেজাজে, বন্ধুদের নিয়ে, আর আজ কেন সে জীর্ণ পোশাক গায়ে নিঃসঙ্গ অবস্থায় বসে আছে এখানে? কেনই বা গতকাল তার দারুণ ফুর্তির মেজাজ ছিল, আর কেনই বা আজ সে এত উন্মনা, বিষণ্নমুখ? যুবকটি তার উত্তরে রাজার কাছে অকপটে স্বীকার করল যে জুয়োখেলাতে তার আসক্তিই এর জন্য দায়ী। বলল সে, বহুবার দ্যূর্তক্রীড়ায় বাজিমাৎ করে বহু অর্থাগম হয়েছিল তার; দু-একবার যে জুয়োখেলার কুপোকাৎ হয় নি সে, তা নয়, তবে সে অর্থ-লোকসান তার কাছে তখন অকিঞ্চিৎকরই ছিল। এবারে সে অতিলোভে বিপুল পরিমাণ অর্থের ঝুঁকি নিয়ে জুয়া খেলেছিল; ভাগ্যের অভিশাপে দ্যূতক্রীড়ায় পর্যুদস্ত হয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছে সে এখন।

বিক্রমাদিত্য সব শুনে যুবকটিকে বললেন, দ্যূতক্রীড়ার মতো

সর্বনাশা কাজ আর কিছুই নেই। যুধিষ্ঠিরের মতো ধর্মপরায়ণ রাজাকে দ্যূতক্রীড়ার চক্রপাশে সর্বস্বান্ত হয়ে বনবাসে যেতে হয়েছিল স্বজনদের সঙ্গে। বিক্রমাদিত্য যুবকটিকে জুয়াখেলার নেশা ত্যাগ করতে বললেন; এই সর্বনাশা নেশা ত্যাগ না করলে জীবনটা তার এই অল্প বয়সেই নষ্ট হয়ে যাবে—সাবধান করে দিলেন তিনি যুবকটিকে। যুবকটি উত্তরে বলল, 'আমার এই দুর্দিনে যদি কেউ আমার আর্থিক অবস্থার সুরাহা করে দেয়, তাহলেই আমি জুয়াখেলার লোভ ত্যাগ করতে পারি।'

ইতিমধ্যে দুজন ব্রাহ্মণ রাজার কাছ এসে বসে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল মন্দিরের ঈশাণকোণে মোহর-ভরা তিনটি কলস আছে, তার পাশেই আছে ভৈরবের বিগ্রহ, নিজরক্তে যে ভৈরব-মূর্তিকে তুষ্ট করতে পারবে, সেই মোহরভরা এই কলস তিনটি লাভ করবে।

রাজা সেকথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের ভিতরে গিয়ে নিজের হাতে তরোয়ালের কোপ দিয়ে রক্ত বার করতে গেলে, জাগ্রত ভৈরব তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন, 'বিক্রমাদিত্য, তোমার উপর খুশী হয়েছি। কি বর প্রার্থনা কর তুমি আমার কাছে?' বিক্রমাদিত্য তখন ভৈরবের কাছে প্রার্থনা জানালেন জুয়াড়ীটিকে যেন মোহরভর্তি কলস তিনটি দিয়ে দেওয়া হয়। ভৈরব বিক্রমাদিত্যের সে প্রার্থনা পূরণ করলেন প্রসন্নমনে। জুয়াড়ীটি সৎপথে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়ে, বিক্রমাদিত্যের স্তুতি করতে করতে নিজগৃহে চলে গেল।

বেতালপুরী নামে এক নগরীতে শোণিতপ্রিয়া নামে এক দেবীর পূজা হত। ঐ নগরীর রাজা ও প্রজারা অন্ধ বিশ্বাসের দ্বারা চালিত হয়ে দেবীর তুষ্টিতে প্রতি বৎসর নরবলি দিত ; দেশের মানুষের কল্যাণ ঘটে নাকি এই কাজে তাদের।

উজ্জয়িনীতে ভ্রমণরত এক পর্যটকের মুখে খবর পেয়ে নিজেই বিক্রমাদিত্য বেতালপুরীতে চলে গেলেন। তিনি সেখানে গিয়ে দেখলেন কয়েকদিন পরেই সেখানে নরবলির ব্যবস্থা হবে।

নরবলির দিন রাজা দেখলেন এক জীর্ণশীর্ণ মানুষের খুঁজেপেতে আনা হয়েছে নরবলির জন্য। লোকটির প্রতি বিক্রমাদিত্যের মায়া হল। বলির পাঁঠার মতো ছটফট করছিল সে, হাত-পা বাঁধা অবস্থাতেই সে তার জীবনভিক্ষা ক'রে সকলের কাছে সকরুণ মিনতি জানাচ্ছিল। বিক্রমাদিত্য এই দৃশ্য দেখে নিজেকে আর সংবরণ করতে পারলেন না। দয়া ও করুণার অবতার বিক্রমাদিত্য বেতালপুরীর রাজার কাছে নিজের প্রাণের বিনিময়ে লোকটির প্রাণভিক্ষা চাইলেন। বেতালপুরীর রাজা বিস্ময়াভিভূত হয়ে গেলেন—মৃত্যুকে অবলীলায় বরণ করতে চায়, মৃত্যুভয়ে ভীত নয় এমন মানুষও পৃথিবীতে আছে। বেতালপুরীর রাজা সম্মতি দিলে বিক্রমাদিত্য যূপকাঠে বাঁধা লোকটিকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই যূপকাঠে গলা বাড়িয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে এক অলৌকিক ঘটনা ঘটে গেল। দেবী শোণিতপ্রিয়া আবির্ভূতা হয়ে বিক্রমাদিত্যকে আশীর্বাদ করে বললেন, 'রাজন, তোমার উপর আমি প্রসন্ন হয়েছি। অন্যের প্রাণ রক্ষায় তুমি প্রাণ-উৎসর্গ করতে গিয়ে এক মহান হৃদয়ের পরিচয় দিয়েছ। তোমার জীবন-উৎসর্গ করতে হবে না, আমি তোমার উপর প্রসন্ন হয়েছি। আমি তোমাকে বর দিতে চাই, বল তুমি কি বর নেবে?' রাজা তখন দেবীর কাছে এই বরই চাইলেন যে বেতালপুরীতে যেন নরবলি চিরতরে বন্ধ হয়। যে নরবলি দেবে তার যেন সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হয়। দেবী 'তথাস্তু' বলে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

উনবিংশ পুতুলের কথা

একদিন বিক্রমাদিত্য রাজসভায় বসে আছেন সভাসদ পরিবৃত হয়ে, এমন সময় এক বিদেশী এসে রাজার মঙ্গল কামনা করে বললেন—যতদিন দেবনদী জাহ্নবী কুলুকুলুনাদে বয়ে চলবে, যতকাল সূর্যদেব আকাশের বুক থেকে পৃথিবী আলোকিত করে রাখবেন, ততকাল পুত্র-পৌত্রসহ রাজ্যশাসন করুন তিনি আনন্দ-সুখে। তারপরেই সেই বিদেশী রাজার স্তুতি করে বললেন, গ্রীষ্মের দিনে আকাশে মেঘের সঞ্চার হলে তৃষিত প্রাণে জলের আশায় ময়ূরের যেমন আনন্দ-উচ্ছ্বাস হয় তেমনই আনন্দের সন্ধান পেয়েছি আমি, আপনার দর্শনের সুযোগলাভে। আমি বিদেশী, আপনার কীর্তির কথা শুনে বহু দূরদেশ থেকে ছুটে এসেছি উজ্জয়িনীতে। হে রাজন, আপনি কল্পতরু, কোনও দানপ্রার্থীকে বিমুখ করেন না আপনি কখনও। ধনেশ্বর নামে আর একজন দানশীল রাজার কথা শুনেছি; যুম্বীর নগরের এই রাজা দীন-দরিদ্রের দুঃখ মোচনে যাচকদের দু-হাতে দান করতেন। তাঁর দানের তুলনায় আপনার দানের খ্যাতি অধিকতর বিস্তৃত। কেননা, আপনার সামর্থ্য যেমন তাঁর চেয়ে বহুগুণ বেশি, দানধ্যানের পরিমাণও আপনার বেশি।’

বিদেশীটির কাছ থেকে নিজের সম্বন্ধে এত স্তুতিকথা শুনে রাজা বেশ অস্বস্তিবোধ করলেন এবং তিনি তাঁকে তাঁর অভিপ্রেত মতো ধনরত্ন দিয়ে বিদায় করে দিলেন।

ত্রিংশ পুতুলের কথা

একদিন এক সুন্দরী রমণীকে সঙ্গে নিয়ে এক যাদুকর উজ্জয়িনীর রাজসভায় এসে বিক্রমাদিত্যকে বলল, 'মহারাজ, ইন্দ্রের সেবক ছিলাম আমি। আমার উপর একবার অসন্তুষ্ট হয়ে দেবরাজ আমাকে স্বর্গ থেকে নির্বাসিত করে দেন মর্তে। আমার সঙ্গে যাকে দেখছেন সে আমার স্ত্রী।' একটু থেমেই গলার স্বরে কিছুটা উত্তেজনা এনে বলল সে, 'দেবাসুরের যুদ্ধ হচ্ছে এখন। আমাকে এখন যুদ্ধে যেতে হবে। আমার স্ত্রীকে আপনার প্রাসাদে রাণীমার কাছে রেখে আমি যুদ্ধে যোগ দিতে যাব, আপনি নিশ্চয়ই আমার স্ত্রীকে কিছুদিনের জন্য রাজপ্রাসাদে রেখে দিতে আপত্তি করবেন না।' বিক্রমাদিত্য সম্মতি না দিয়ে পারলেন না। তার স্ত্রীর প্রতি রাজার সহানুভূতিই হল, তার স্বামী যুদ্ধে চলেছে, এই অবস্থায় তার মনের অবস্থা বুঝে তিনি তাকে স্নেহার্দ্র হৃদয়ে রাণীর কাছে রেখে দিলেন।

তারপর যাদুকর খড়্গের উপর ভর দিয়ে আকাশে মিলিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে প্রাসাদের চাতালে একখানা রক্তমাখা খড়্গ এবং রক্তমাখা একটি হাত এসে পড়ল। রাজা সে দৃশ্য দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন। তারপরে আর একটি রক্তাক্ত হাত এসে পড়ল সেখানে। রাজ-পরিবারের লোকদের উত্তেজনা চরমে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে সেই যাদুকরের রক্তাক্ত ধড় ও মাথা বিচ্ছিন্ন হয়ে এসে পড়ল। রাজা দেখলেন সেই যোদ্ধারই দ্বিখণ্ডিত দেহ। ঐ দ্বিখণ্ডিত দেহটি দেখেই তার স্ত্রী চিনতে পারলেন এটি তার স্বামীরই। তখন সে শোকে দুঃখে সকলের বাধা না মেনে আগুনে ঝাঁপ দিয়ে স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করল।

কয়েকদিন পর খড়্গহাতে যোদ্ধার বেশে সেই ঐন্দ্রজালিক রাজার কাছে এসে সুখবর দিল যে দেবতাদের কাছে অসুরেরা পরাজয় বরণ করেছে। তার বীরত্বে ইন্দ্র প্রসন্ন হয়ে তার শাপমুক্তি ঘটিয়েছেন,

জানাল সে। রাজাকে বলল সে, 'আমাকে ইন্দ্র আবার স্বর্গে থাকতে বলেছেন। আমার স্ত্রীকে নিয়ে স্বর্গে চলে যাব আবার।' তার এই কথা শুনে বিক্রমাদিত্য অশ্রুভরা চোখে বললেন, 'হে বিদেশী, কি বলে যে তোমাকে সান্ত্বনা দেব জানিনা, তোমার স্ত্রী স্বেচ্ছায় নিজের দেহকে আহুতি দিয়েছে অগ্নিদেবের কাছে।'

ইন্দ্রজালিক তখন নিজের পেশার কথা বলে রাজাকে বলল, সমস্ত ঘটানাটাই একটা সাজানো ব্যাপার। ভোজবাজী দেখানো হয়েছিল তাঁকে।

রাজা তাঁর এই যাদুচাতুরীর তারিফ করে বহু মূল্যবান ধনরত্ন দিয়ে পুরস্কৃত করলেন যাদুকরকে।

একত্রিংশ পুতুলের কথা

একদিন এক দিগম্বর সন্ন্যাসী এসে রাজার হাতে একটি ফল দিয়ে আশীর্বাদ করে বললেন যে তিনি কৃষ্ণ-চতুর্দশীর দিন শ্মশানে হোম করবেন। বিক্রমাদিত্যকেই তিনি তাঁর উত্তরসাধক হিসাবে ঠিক করেছেন বললেন। তিনি জানালেন, বিক্রমাদিত্যকে তিনি পছন্দ করেছেন এই কারণে যে তার মতো উন্নতমনা ও পরোপকারী মানুষই তাঁর যজ্ঞের সহায়ক হবার উপযুক্ত। রাজা সেই দিগম্বর সন্ন্যাসীর উত্তরসাধক হতে সম্মত হলেন। সন্ন্যাসী রাজাকে সন্ধান দিলেন যে ঐ শ্মশানের কিছুটা দূরেই এক শমীবৃক্ষে শিবের অনুচর, ভূতে ভর করা শব বেতাল ঝুলে আছে। বিক্রমাদিত্যকে তিনি নির্দেশ দিলেন যে বেতালকে কাঁধে নিয়ে আসতে হবে যজ্ঞস্থলে একটি কথাও না বলে, সারাটা পথ মৌন অবলম্বন করতে হবে রাজাকে।

কৃষ্ণ-চতুর্দশীর দিন রাজা শ্মশানে যজ্ঞস্থলে এসে পৌঁছলে সন্ন্যাসী তাঁকে শমীবৃক্ষের পথ দেখিয়ে দিলেন। রাজা শমীবৃক্ষ থেকে বেতালকে কাঁধে নিয়ে নিঃশব্দে শ্মশানের দিকে চললেন। বেতালের মধ্যে যে অশরীরি আত্মা ছিল সে তাঁকে বলল কোনো গল্প শোনাতে পথে চলতে চলতে। কিন্তু সন্ন্যাসীর নির্দেশ অনুযায়ী মৌনভঙ্গের ভয়ে রাজা মুখ খুলতে পারলেন না। বেতাল তা বুঝতে পেরে বলল, সে নিজেই গল্প শোনাবে রাজাকে। তবে রাজাকে সে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলল যে গল্প-শেষে গল্পের বিষয় থেকে প্রশ্ন করবে সে রাজাকে, তার যদি সঠিক উত্তর না দেন রাজা, তাহলে তাঁর শিরোচ্ছেদ করবে সে। বেতাল গল্প শুরু করল—

"হিমালয়ের দক্ষিণে অবস্থিত বিন্ধ্যবতী নগরীর রাজা সুবিচারের পুত্র ময়সেন শিকার করতে বেরিয়েছিল সেদিন। এক হরিণের দেখা পেয়ে তার পিছু নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে ছুটতে ছুটতে গভীর জঙ্গলে এসে পড়ল সে। সেখানে এসে হরিণ তাকে ফাঁকি দিয়ে কোথায় যে পালিয়ে

গেল আর তার খোঁজ পেল না। ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে চলল সে। ঘোরাপথ দিয়ে নগরীর পথে ফিরে যাওয়ার সময়ে ক্লান্ত তৃষ্ণার্ত হয়ে একটা নদীর কাছে এসে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল সে। নদীর পাড়ে এক ব্রাহ্মণকে বসা দেখে ময়সেন বলল তাকে, সে নদীর জল পান করবে, ঘোড়াটির উপর যেন সে একটু নজর রাখে। কিন্তু ব্রাহ্মণ সে দায়িত্ব নিতে রাজী হল না। তখন রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে ময়সেন তাঁকে প্রচণ্ড কশাঘাত করল। ক্ষতবিক্ষত দেহ নিয়ে ব্রাহ্মণ সোজা রাজা সুবিচারের কাছে গিয়ে তাঁর পুত্র ময়সেনের বিরুদ্ধে নালিশ করল।

রাজা তা শুনে ময়সেনকে রূঢ়ভাবে ভৎ´সনা করলেন তার গর্হিত আচরণের জন্য এবং তার এই অন্যায় কাজের শাস্তিস্বরূপ তাকে রাজ্য ত্যাগ করে চলে যেতে আদেশ দিলেন। মন্ত্রী রাজপুত্রের প্রতি রাজার এই নির্বাসন আদেশ ফিরিয়ে নিতে বললেন। কিন্তু রাজা পুত্রের প্রতি কোন দুর্বলতা দেখালেন না। অন্যায়ের শাস্তি তিনি দেবেনই, অন্যায়কারী তাঁর পুত্রই হোক, আর যেই হোক তাকে শাস্তি পেতেই হবে। রাজার কঠোর বিধান।

ময়সেনের প্রতি রাজার এই চরম শাস্তির আদেশের কথা শুনে রাজার কাছে এসে ব্রাহ্মণ আকুলভাবে প্রার্থনা জানালেন যেন ময়সেনকে রাজ্য থেকে নির্বাসিত করা না হয়। ভবিষ্যতে রাজ-সিংহাসনে বসার সুযোগ যাতে সে পায় তার জন্য তার প্রতি রাজ্য থেকে বহিষ্কার-আদেশ রদ করা উচিত, বললেন ব্রাহ্মণ রাজাকে। যার উপর অত্যাচার করেছিল ময়সেন সেই ব্রাহ্মণই ময়সেনের জন্য ক্ষমাভিক্ষা চাইলেন রাজার কাছে। অথচ পিতা হয়ে রাজা সুবিচার পুত্রের এই অন্যায় কাজের জন্য মার্জনা করতে পারলেন না।"

গল্পটি শুনিয়ে বেতাল বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞেস করল, চরিত্রবলের দিক থেকে রাজা সুবিচার আর ব্রাহ্মণের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ। বিক্রমাদিত্য রাজা সুবিচারকেই শ্রেষ্ঠ বলে অভিমত দিলেন। বিক্রমাদিত্যের মৌন-ভঙ্গের ফলে বেতাল আবার শমীবৃক্ষ চলে গেল। রাজা আবার যখন বেতালকে শমীবৃক্ষ থেকে নামিয়ে শ্মশানের দিকে নিয়ে আসছিলেন

তখন বেতাল তাকে আর একটি গল্প বলে তার কাছ থেকে সঠিক প্রশ্নোত্তর পেয়ে আবার শমীবৃক্ষে চলে গেল। এইভাবে বেতাল একে একে পঁচিশটি গল্প বলেছিল বিক্রমাদিত্যকে, প্রতিটি ক্ষেত্রে রাজার বিচক্ষণ উত্তর পেয়ে বেতাল তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে শেষে বলল, দিগম্বর সন্ন্যাসীটি তাঁকে হত্যা করে তাঁর মাংস দিয়ে হোমযজ্ঞ করে অষ্টসিদ্ধি লাভ করবে। বেতাল রাজাকে শিখিয়ে দিল যে দিগম্বর যখন তাঁকে হত্যার উদ্দেশ্যে বলবে অগ্নিকুণ্ড প্রদক্ষিণ করে মাথা নীচু করে দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম করতে তখন তিনি যেন বলেন যে তিনি রাজা, মাথা নীচু করে কাউকে তিনি প্রণাম করেন নি আজ পর্যন্ত, তাঁকে যদি দেখিয়ে দেওয়া হয়, কিভাবে প্রণাম করতে হয় তাহলে তিনি প্রণাম করতে পারবেন। দিগম্বর যখন মাথা নীচু করে প্রণাম করে দেখাবে তখনই তার গলা খড়্গ দিয়ে কেটে দিতে বলল বেতাল রাজাকে।

বেতালের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করে দিগম্বরের হাতে বিক্রমাদিত্যকে মরতে হল না, বিক্রমাদিত্যের হাতেই দিগম্বরের মৃত্যু হল। ফলে বিক্রমাদিত্যেরই অষ্টসিদ্ধি লাভ হল।

"পৃথিবীতে যত রাজা রাজত্ব করেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন বিক্রমাদিত্য। তিনি সকলের দুঃখকষ্ট নিবারণে সঁপে দিয়েছিলেন তাঁর সমগ্র জীবনকে। বিক্রমাদিত্যের মতো মহাসত্ত্ব বা মহাপ্রাণ মানুষ পৃথিবীতে আর খুঁজে পাবেন না।' বত্রিশতম পুতুল বলল ভোজরাজকে এই কথা।

তা শুনে ভোজরাজ নীরব হয়ে রইলেন। তখন বত্রিশটি পুতুল সমস্বরে ভোজরাজের ভূয়সী প্রশংসা করে বলল, 'হে ভোজরাজ, বিক্রমাদিত্যের মতো আপনিও অশেষ গুণসম্পন্ন। আপনার মতো আদর্শবান পুরুষ ও পুণ্যচরিত্রের মানুষের কৃপায় আমাদের পাপক্ষয় হল এবং শাপমুক্তি হল আমাদের।'

ভোজরাজ কৌতূহলী হয়ে তাদের পাপ ও শাপমুক্তির বিষয় জানতে চাইলেন।

তখন পুতুলেরা বলল, 'আমরা বত্রিশজন দিব্যাঙ্গনা পার্বতীর ঘনিষ্ঠ সখী ছিলাম। পার্বতীর সঙ্গে আমাদের অন্তরঙ্গতা ছিল গভীর। পার্বতীও ভালবাসতেন আমাদের অন্তর দিয়ে।

একদিন মহেশ্বর আমাদের কাছে বসে সৃষ্টি-ধ্বংসলীলার মধ্যে যে জীবন-প্রবাহ রয়েছে তার কথাই বলছিলেন। পার্বতী সকলের অলক্ষ্যে কখন যে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন আমরা কোন সখীই তাঁর অস্তিত্ব খেয়াল করতে পারি নি। তখনই পার্বতী আমাদের ভুল বুঝে এই বলে অভিশাপ দিলেন যে আমরা প্রত্যেকে পুতুল হয়ে ইন্দ্রের সিংহাসনে খোদিত হয়ে থাকব। তখন আমরা সকলে পার্বতীর কাছে মিনতি করে জানতে চাইলাম আমাদের শাপের অবসান কি করে হবে। পার্বতী বললেন, 'এই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হবেন রাজা বিক্রমাদিত্য, তারপরে একদিন এই সিংহাসন ভোজরাজের মালিকানায় আসবে। ভোজরাজকে

এই সিংহাসনে বসা থেকে নিবৃত্ত করে তোমরা একে একে বিক্রমাদিত্যের চরিত-কথা শোনাবে তাঁকে এবং তোমাদের বত্রিশজনেরই যখন বিক্রমাদিত্যের চরিত-কথা বলা শেষ হবে ভোজরাজের কাছে, তখনই শাপমুক্তি হবে তোমাদের।'

বত্রিশ পুতুলের মুখে বিক্রমাদিত্যের চরিত-কথা সম্পূর্ণ শুনলেন যখন ভোজরাজ, সঙ্গে সঙ্গে পুতুলদেরও পাপক্ষয় ও শাপমুক্তি হল এবং দিব্যাঙ্গনারা ভোজরাজকে বিদায় জানিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

বিক্রমাদিত্যকে প্রদত্ত ইন্দ্রের এই দিব্য সিংহাসনে উপবেশন করতে অনিচ্ছুক হলেন ভোজরাজ। তিনি সিংহাসনে অষ্টদল স্থাপনে করে তার উপরে হর-পার্বতীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে ষোড়শপোচারে যুগল মূর্তির পূজার ব্যবস্থা করেছিলেন নিত্য এবং অপত্যস্নেহ উজাড় করে পিতার মতো লালন পালন করেছিলেন তাঁর প্রজাদের চিরকাল।

—



দাম
১০·০০